কপিলদেব: সফল হবেন, তার পর ● আনন্দমেলা-জিপিও স্ট্যাম্প ক্লাব

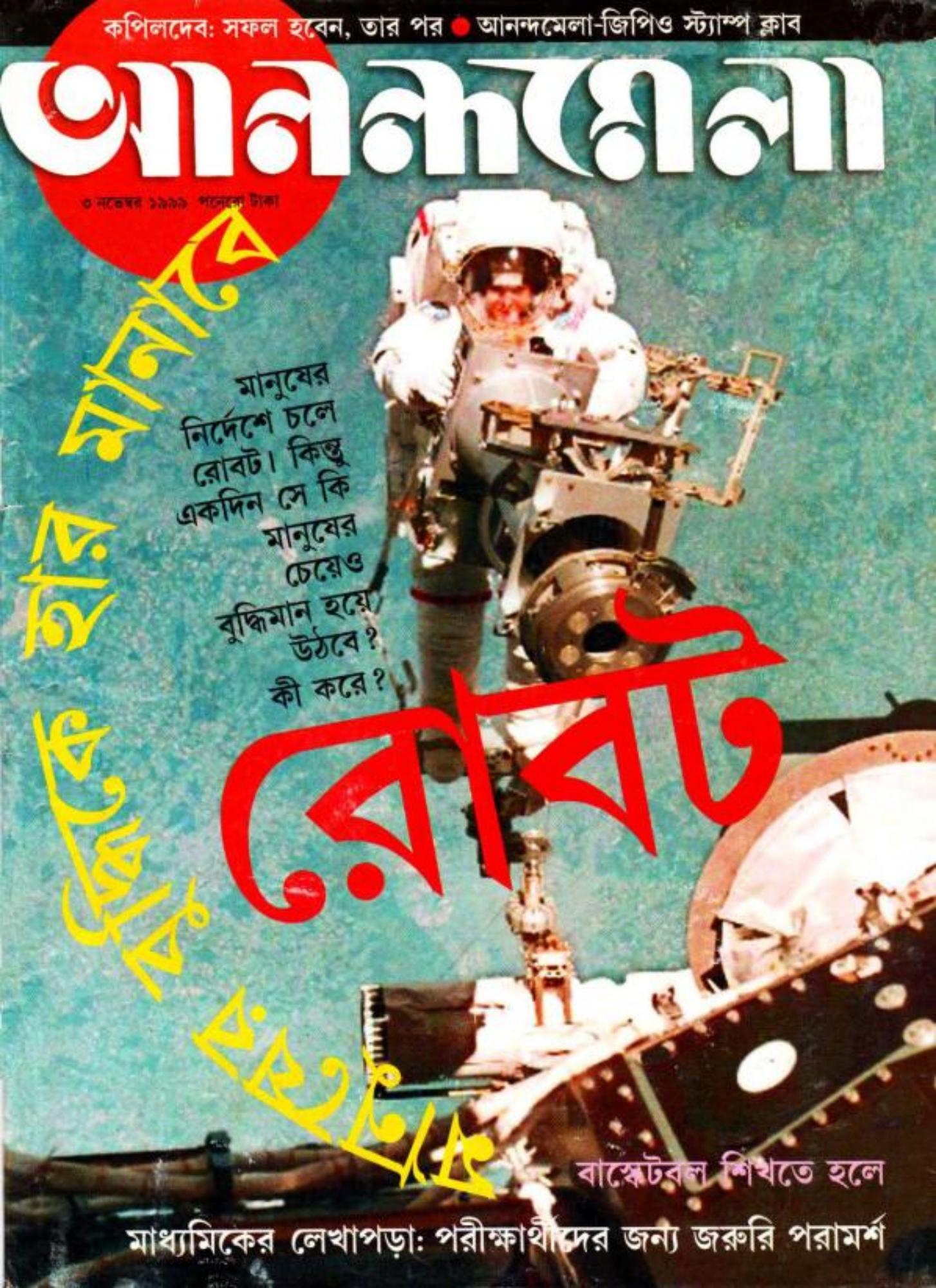

আনন্দমেলা

৩ নভেম্বর ১৯৯৯ পনেরো টাকা

বাস্কেটবল শিখতে হলে

মাধ্যমিকের লেখাপড়া: পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি পরামর্শ

PARLE

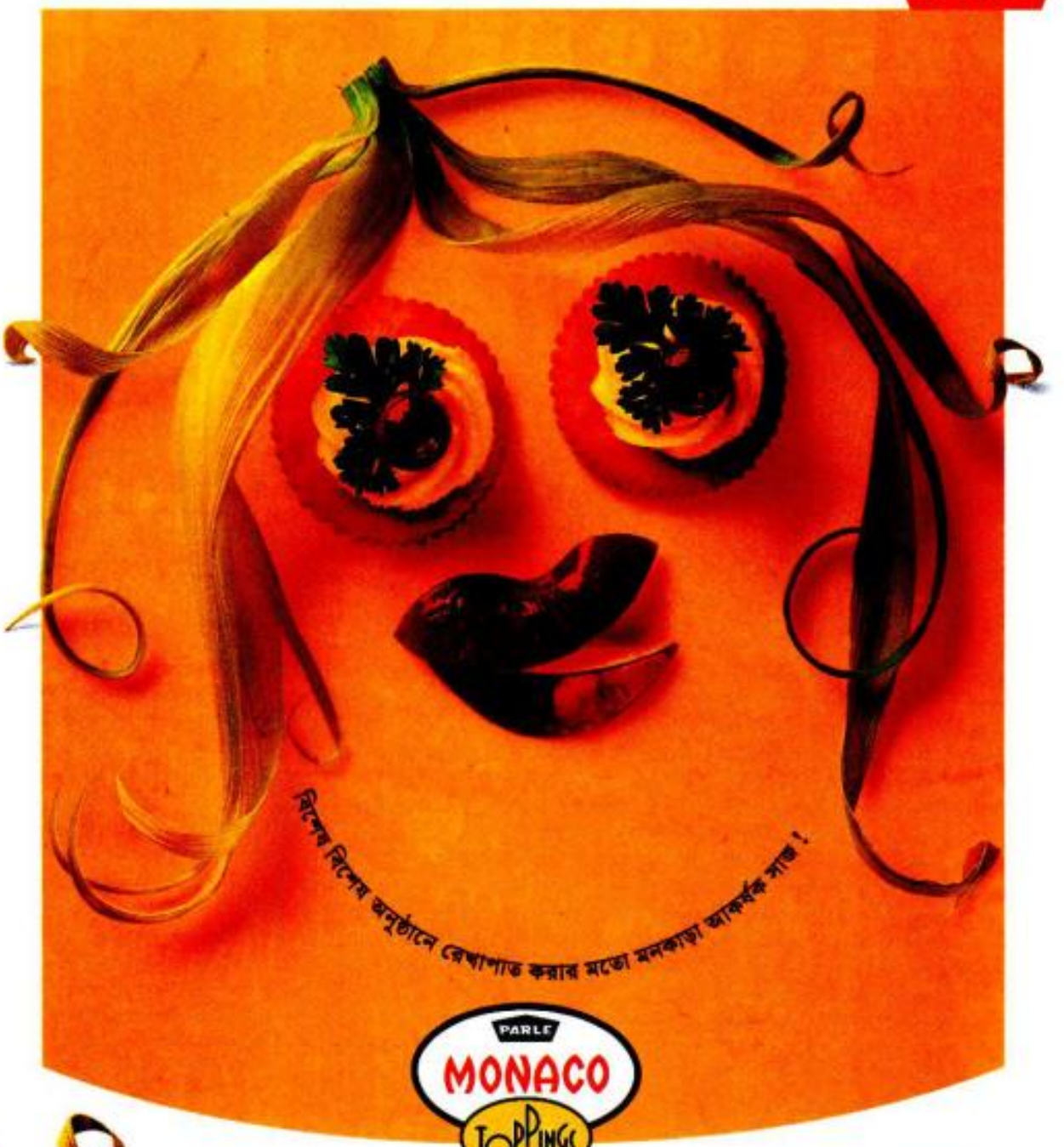

SIMPLY MADE, SIMPLY GREAT

মনকাড়া সাজে যে-কোনও অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে সাজিয়ে তুলতে অদ্বিতীয় মোনাকো টপিংস। সবার প্রাণমন টানে। হাতের কাছেই উদাহরণ-ওপরের রেসিপিটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, ***মোনাকো-র ওপর সাধাসিধে ক্রিমের পরত, সঙ্গে একফালি চেরী****।* কী মনোহারী, জিভে-জল-আসা আইটেম, আর কতো দৃষ্টিনন্দন। তাই, হোক না কোনও মিলনচক্র বা আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান বা জমাটি পার্টিসার্টি, বা রোজকার আহারের ফাঁকেফাঁকে মুখচালানোর অজুহাত। সবেতেই মোনাকো টপিংস অনুপম, জুড়িহীন। হ্যাঁ, আপনার উপকরণ হতে পারে যা-কিছু বা সবকিছু। হেঁসেলঘরে থাকা প্রায় সবকিছুই চলতে পারে। একচিলতে টম্যাটো, সঙ্গে একটুকরো সেদ্ধ ডিম বা আলু, একফালি শশা বা বাড়তি শাকসব্জি, টম্যাটো কেচ-আপ, চীজ বা চাট,... কোনও কিছুই ফ্যালনা নয়। মিনিটকয়েকের ফুরসতে আপনি বানাতে পারেন মুখরোচক মোনাকো টপিংস ! তবে সবকিছুতেই চাই এক জরুরি উপকরণ-আপনার কল্পনাশক্তি। হ্যাঁ, আপনি যদি হাতের কাছেপিঠে কিছু রেডিমেড আইডিয়া মজুত রাখতে চান, তবে বিনামূল্যে মোনাকো টপিংস রেসিপি পুস্তিকার জন্য আমাদের কাছে লিখুন। আর দেখুন আপনার ইমেজ লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় গিয়ে উঠছে !

visit us at www.parle.com

*(উপরে দেখানো ছবিটির মতোই টপিংস বানানোর দরকার নেই। টপিংসের উপকরণ ও চেহারা হবে আপনার খুশিমতো)। বিনামূল্যে মোনাকো টপিংস রেসিপি পুস্তিকার জন্য লিখুন এখানে: মোনাকো টপিংস, পি.ও. বক্স ৩৯৯, মুম্বই ৪০০ ০০১।

২৫ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৬ কার্তিক ১৪০৬ ৩ নভেম্বর ১৯৯৯

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

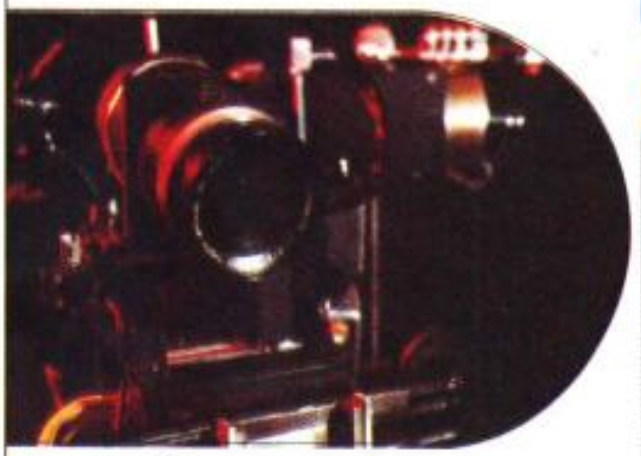

প্রচ্ছদকাহিনী

মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান রোবট

১২ শিশুরা এলোমেলোভাবে হাত নাড়তে নাড়তে স্পর্শের বিভিন্ন মাত্রা শেখে। নিউরোজেনের তৈরি 'ইনফ্যান্ট' নামে একটি রোবটের হাতের শেখার ধরন শিশুদের মতো। নিজেই নিজের ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়ার চমকপ্রদ 'লজিক' বিন্যাস আছে ইনফ্যান্টের কম্পিউটার মগজে। উন্নত রোবট নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। রোবটের বুদ্ধি আগামী শতকে মানুষের বুদ্ধির সীমা ছাড়াতে পারে। তবে মানব-কল্যাণে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান রোবট বা অ্যানড্রয়েড তৈরি উচিত কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রোবট-বিজ্ঞানের একেবারে সাম্প্রতিকতম খবর জানিয়েছেন সুব্রত রায়।

প্রাণী ও প্রকৃতি

মাপিনগুয়ারি

৬ ইয়েতির পর আর এক রহস্যময় প্রাণীর কথা শোনা যাচ্ছে। সে অবশ্য ইয়েতির মতো বরফ-ঢাকা পাহাড়ে থাকে না। থাকে আমাজনের জঙ্গলে। নাম মাপিনগুয়ারি। কেউ বলছে তাকে চোখে দেখেছে, কেউ বলছে দেখেনি। আলোচনা করেছেন জয় সেনগুপ্ত।

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

২৮ আর চার মাস পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা নিশ্চয় জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। 'আনন্দমেলা'-ও যতটা সম্ভব তাদের সাহায্য করছে। এবারের আলোচনাতে অংশ নিয়েছেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী।

খেলাধুলো

সফল হবেন, তার পর?

৫৬ অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার কপিল দেব ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। আবার তিনি ফিরে এসেছেন ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে। ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে তিনি সফল। কিন্তু তার পর? গৌতম ভট্টাচার্য বিশ্লেষণ করেছেন কোচ কপিল দেবের শক্তি ও দুর্বলতার কথা।

অন্যান্য

বিভাগ

ইন্টারনেট • সৌরভ চক্রবর্তী ৪
আনন্দমেলা জিপিও স্ট্যাম্প-ক্লাব ৮
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে • বিমল বসু ১০
খাদে এক খেলনাগাড়ি
সঞ্জীব সিংহ ২৩
পাণ্ডব গোয়েন্দা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৪২
কুইজ ৪৮
ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি • অনীশ দেব ৫২
ওলটপালট ও শব্দসন্ধান ৫৩
বিনোদন • মণিশঙ্কর দেবনাথ ৫৫
নিশার লক্ষ্য আগামী এশিয়াডের সোনা • প্রদীপ্ত রায়চৌধুরী ৫৯
ডাবলসের খেতাব...
প্রতাপ জানা ৬০
বাস্কেটবল শিখতে হলে • আর্যভট্ট খান ৬২
টেস্টে ওপেনারের অভাব... • চন্দন রুদ্র ৬৪
ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন আশা
বিজয় ভরদ্বাজ
তানাজি সেনগুপ্ত ৬৫
নিয়মিত কমিক্স : ২২, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৪

প্রচ্ছদের ফোটো : এ এফ পি

সম্পাদক
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লি-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১২ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, কাঠমাণ্ডু, পোর্টব্লেয়ার, শিলচর, ইম্ফল, গ্যাংটক ৫০ পয়সা।

মাপিনগুয়ারি কি সত্যিই আছে

বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে বুনিপ নামে এক রহস্যময় প্রাণীর উল্লেখ আছে। তেমনই এক প্রাণী ব্রাজিলের মাপিনগুয়ারি। এ প্রাণী কি নিছক কল্পনার? জানিয়েছেন জয় সেনগুপ্ত

কয়েক মাস আগের কথা। খুব খুশির মেজাজে ছিলেন দোস সান্তোস। আনন্দে গুন্‌গুন করে গান গাইছিলেন। খুশির কারণ, একসঙ্গে চারটে সাদা ঠোঁটঅলা পেক্যারি (শূকরের মতো দেখতে একরকম প্রাণী) শিকার করেছেন তিনি। একটা পেক্যারির মাংস কেটে কীভাবে সেটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই কথাই ভাবছিলেন সান্তোস। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর রক্ত-হিম-করা আওয়াজ ভেসে এল সামনের জঙ্গলের ভেতর থেকে। এমনই বীভৎস সেই চিৎকার যে, অতি সাহসী মানুষও আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়বে। মনে হল ফুট পঞ্চাশেক দূর থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। মুহূর্তের মধ্যে সান্তোস হাতের সবকিছু মাটিতে ফেলে ছুটতে আরম্ভ করলেন। আবার শোনা গেল সেই বীভৎস চিৎকার। এবার একটু দূরে। দুলে উঠল গাছপালা। পরপর আরও দু'বার শোনা গেল ওই চিৎকার। তবে এবার অনেকটা আস্তে। মনে হল প্রাণীটা যেন চলে যাচ্ছে জঙ্গলের গভীরে। আতঙ্কে সান্তোস নেমে পড়েছিলেন সামনের একটা নদীতে। প্রায় এক ঘণ্টা জলের মধ্যে ডুবে বসে থেকে আবার ফিরে এসেছিলেন আগের জায়গায়।

গ্রাউন্ড স্লথের নিকট আত্মীয় ঘুমকাতুরে স্লথ

রেন ফরেস্টের গাছের ডালে ঘুরে বেড়ায় এজেন্টেটা বর্গের প্রাণী স্লথ। অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া অতিকায় গ্রাউন্ড স্লথের নিকট আত্মীয় বলা যেতে পারে এদের। এদের দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ২৮ ইঞ্চি, লেজের দৈর্ঘ্য মাত্রই ইঞ্চি দুয়েক। স্লথ সম্ভবত জীবজন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে অলস প্রাণী। গাছের ডালে ঝুলতে-ঝুলতে প্রায় ঘুমিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দেয় এরা। নিরামিশাষী এই প্রাণীর প্রধান খাদ্য গাছের পাতা। স্লথ নিশাচর প্রাণী। দল বেঁধে ঘোরে না, একা-একা থাকতেই ভালবাসে। একটি স্লথ দিনের পর দিন একই জায়গায় ঝুলছে একই ভাবে, আর তার গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে, এমন দৃশ্যও বিরল নয়।

বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় সান্তোসের মুখ থেকে এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলেন প্রাণিবিজ্ঞানী ডেভিড ওরেন আর তাঁর দলের লোকজন। ব্রাজিলের রেন ফরেস্টে অজানা ওই প্রাণীটিরই সন্ধানে এসেছেন ডেভিড ওরেন। পাশেই বারবা গ্রাম, গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী প্রাণীটির সমস্ত শরীর লম্বা লাল লোমে ঢাকা। পেছনের দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে মানুষের মতো সোজা হয়ে যখন দাঁড়ায়, তখন উচ্চতা হয় প্রায় ৬ ফুট। আর শরীর থেকে নির্গত হয় এক অদ্ভুত দুর্গন্ধ। ওখানকার অধিবাসীরা প্রাণীটির নাম দিয়েছে মাপিনগুয়ারি। এই রহস্যময় প্রাণীটি নাকি জল এড়িয়ে চলে, ভ্রাম্যমাণ পেক্যারি-র দলের মধ্যে থেকে তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে, রাত নামলেই গবাদি পশুর ওপর আক্রমণ চালায় আর রাইফেলের গুলিও নাকি এদের খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না। সান্তোস নাকি একবার একটি মাপিনগুয়ারি দেখেছিলেন, সেটার থাবাগুলো ছিল একটা বিশাল আর্মাডিলোর মতো, মুখটা বানরের মতো আর গা দিয়ে যথারীতি বেরোচ্ছিল দুর্গন্ধ।

ওরেন প্রথম এই প্রাণীটি সম্বন্ধে জানতে পারেন প্রায় ২০ বছর আগে। সেই সময় বিভিন্ন পাখি নিয়ে গবেষণা করার জন্য ব্রাজিলের এই অরণ্যে এসেছিলেন তিনি। তখন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেননি প্রাণীটির অস্তিত্বের কথা। কারণ ব্রাজিলের রেন ফরেস্টে নানারকম উদ্ভট গল্পের প্রচলন আছে। কিন্তু দিনের পর দিন বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে মাপিনগুয়ারির বর্ণনা শুনতে-শুনতে ১৯৯৪ সালে ওরেন সিদ্ধান্তে পৌঁছন, মাপিনগুয়ারির অস্তিত্ব হয়তো বা মিথ্যে নয়। ওরেন ৫০ জনেরও বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাঁরা কোনও না কোনও সময় মাপিনগুয়ারির মুখোমুখি হয়েছেন।

এমনই একজন হলেন মারিও পেরিরা ডি'সুজা। ১৯৭৫ সালে ডি সুজা জামাউঝিম নদীর পাশ বরাবর একটি খনিতে কাজ করছিলেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন বিশাল আকৃতির একটি প্রাণী পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে মানুষের মতো সোজা হয়ে দাড়িয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে টলমল করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। জন্তুটির গা থেকে বেরোচ্ছে অদ্ভুত দুর্গন্ধ। "ওই বীভৎস গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে আরম্ভ করল। সুস্থ হয়ে উঠতে আমার সময় লেগেছিল প্রায় দু'মাস", পরে জানিয়েছেন ডি সুজা।

ওরেনের মতে, প্রাণীটি প্রায় তিন কোটি বছর আগেকার বিশাল আকৃতির গ্রাউন্ড স্লথ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং অত্যধিক শিকার করার ফলে বহু বছর আগে অবলুপ্ত হয়ে যায় প্রাণীটি। ওরেনের ধারণা, গ্রাউন্ড স্লথের ফসিলে সমৃদ্ধ এই রেন ফরেস্টে জীবন্ত গ্রাউন্ড স্লথের অস্তিত্ব থাকতেই পারে।

১৮০০ সালের শেষের দিকে আর্জেন্টিনার প্রত্নপ্রাণিতত্ত্ববিদ ফলোরোন্তিনো আমেগিনো একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে অজানা এক জন্তুর বর্ণনা শোনেন, যার সঙ্গে গ্রাউন্ড স্লথের মিল আছে খুবই। বার্নার্ড হুভেলমান্স ১৯৫৫ সালে এই নিয়ে লেখেন 'অন দ্য ট্রাক অব আননোন অ্যানিম্যালস'। ওই বইটি পড়েই এই প্রাণীটি সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন ওরেন।

মাপিনগুয়ারির সন্ধানে অভিযান চালাতে গিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট আর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ওরেন আর তাঁর দলকে। রেন ফরেস্টে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পৌঁছতে পারে না। সেজন্য দিনের বেলাও জায়গাটা থাকে আলো-আঁধারি। বৃষ্টির জন্য সমস্ত অঞ্চলটা ভিজে থাকে সারা বছরই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে পরজীবী পোকা, মাকড়সা, বিষাক্ত পিঁপড়ে, ম্যালেরিয়া সংক্রামক মশা, বোলতা, ভিমরুল, মৌমাছি, 'ব্ল্যাকফ্লাই', 'হোয়াইটফ্লাই' আর ভয়ঙ্কর 'ব্যাটফ্লাই'। সবরকম বাধা উপেক্ষা করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে ওরেন আর তাঁর দলকে। কখনও-কখনও দিনে আট ঘন্টাও হাঁটতে হয়েছে তাঁদের।

এত পরিশ্রম করেও কিন্তু ওরেন মাপিনগুয়ারির দেখা পাননি। সংগ্রহ করতে পারেননি তেমন নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ, যা থেকে মাপিনগুয়ারির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া চলে। অবশ্য পেয়েছেন বিশাল আকৃতির অজানা কোনও প্রাণীর পায়ের ছাপ আর কিছু লোম। কিন্তু এগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ নয়। অথচ মাপিনগুয়ারি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এই জঙ্গলের আশেপাশের গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে। শটগান ছাড়া জঙ্গলের ধারেকাছে আসতে সাহস পায় না কেউ। সন্ধের পর ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে বেরোতে দেওয়া হয় না।

বিজ্ঞান

যেখানে যা হচ্ছে

নতুন শতাব্দীর দৌড়-গাড়ি

দীর্ঘ ৫০ বছর পর ফের গাড়ির দৌড়ে নামতে চলেছে বিশ্ববিখ্যাত ক্যাডিলাক কোম্পানি। বিলাসবহুল মহামূল্য যাত্রী-গাড়ি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত এই সংস্থা এজন্য 'স্পোর্টস কার' তৈরি করবে বলে ঘোষণা করে দেওয়ায় রীতিমত চমকের সৃষ্টি হয়েছে। ২০০০ সালে 'লে-ম্যানস' গাড়ি-দৌড়ে নামানো হবে ওই কার। ফলে ওই প্রতিযোগিতায় ক্রাইসলার ও সেভি কোম্পানির রেসিং কারের কড়া প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে ক্যাডিলাকের দৌড়-গাড়ি। এই গাড়ির শ্যাসি অর্থাৎ মূল কাঠামো তৈরির ভার দেওয়া হয়েছে 'রিলে' ও 'স্কট' নামে দুটি বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে। এর ৬০০ অশ্বশক্তির এঞ্জিনটি নির্মাণ করবে ডেট্রয়েটের 'ম্যাকলারেন এঞ্জিনিয়ারিং' সংস্থা। নতুন শতাব্দীর এই দৌড়-গাড়ির পেছনে ক্যাডিলাক তিন কোটি ডলার পর্যন্ত খরচ করতে প্রস্তুত। গাড়ির পরীক্ষামূলক মডেলটি বেরিয়ে যাবে আগামী জুনের মধ্যেই। এর পর কয়েক মাস ধরে চলবে এর যাচাই পরীক্ষা। প্রস্তুতির জন্য যোগ দেবে ১২ এবং ২৪ ঘণ্টার দুটি প্রতিযোগিতায়। এই গাড়িতে থাকবে 'নাইট ভিশন' ক্যামেরা, প্রতিযোগিতার পথে রাত্রি নামলে যা চালককে বহু দূর পর্যন্ত দেখতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া চলার পথে গাড়িটি কখন কোথায় রয়েছে তার দৃশ্যও টিভিতে দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মজুত থাকবে। ১৯৫০ সালে ক্যাডিলাক দুটি রেসিং কার তৈরি করে প্রতিযোগিতায় নামিয়েছিল। গাড়ি দুটি পেয়েছিল যথাক্রমে ১১ ও ১২-তম স্থান। সংস্থার নতুন শতাব্দীর দৌড়-গাড়ি শীর্ষ বা তার কাছাকাছি স্থান দখল করতে পারে কি না সেটাই দেখার।

মজার খেলনা

এ এক মজার খেলনা। টিপলেই আকারে আয়তনে বাড়ে। তাই এর নাম 'এক্সপ্যান্ডাগন'। এমনিতে অষ্টতল ঘনকের মতো। কিন্তু খেলনাটির নীল বিন্দুগুলিতে আঙুল দিয়ে চাপ দিলেই তা আয়তনে বাড়তে থাকে, আকারেও বদলে যায়। ত্রিভুজ ও বর্গাকার ছোট-ছোট প্লেট জুড়ে খেলনাটি তৈরি। নীল বিন্দুগুলি হল তাদের সংযোগস্থল। 'হোবারম্যান ডিজাইন' সংস্থার এই অভিনব মজার খেলনাটির দাম ২০ থেকে ৬০ ডলার। কতগুলি খণ্ড জুড়ে এটি তৈরি তার ওপরেই দাম নির্ভর করে।

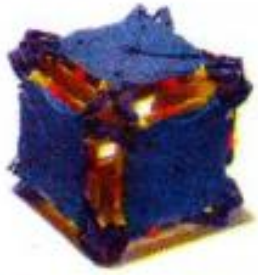

নিখুঁত সাফাই

বাড়িতে অতিথি আসবেন। ঘরদোর দ্রুত পরিষ্কার করার জন্য ঝাঁটা-ন্যাতা নয়, এ যুগের মুশকিল-আসান হল 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার'। বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি করে যে যন্ত্র তার পেটের মধ্যে টেনে নেয় যাবতীয় ধুলোময়লা। তাই বহু পরিবারেই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আজ এক অত্যাবশ্যক সামগ্রী। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে এই যন্ত্রও ক্রমশ আকারে ছোট হচ্ছে, কার্যকারিতায় বহুগুণিত। এমনই এক বহুমুখী ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বের করেছে 'ডার্ট ডেভিল' নামে একটি সংস্থা। খুব শক্ত তলও পরিষ্কার করতে পারে এদের 'পাওয়ার স্টিক' সাফাই যন্ত্র। আর ময়লা টানার মুখটা ত্রিভুজাকৃতির হওয়ায় ঘরের কোণের ময়লাও শুষে নিতে পারে অনায়াসে। প্রচলিত 'ভ্যাকুয়াম ব্যাগ'-এর বদলে ময়লা সঞ্চয়ের জন্য এতে আছে 'কালেকশন কাপ', যা সহজেই খালি করা যায়। অন্যান্য সহযোগী অংশগুলিও এমন সব জায়গা থেকে নিখুঁত সাফাই করে, সহজে যার নাগাল পাওয়া মুশকিল। যন্ত্রটির দাম ৪০ ডলার।

খুদে ডি ভি ডি প্লেয়ার

'পোর্টেবল' অর্থাৎ বহনযোগ্য ডি ভি ডি প্লেয়ার এখন আর একেবারে নতুন জিনিস নয়। অনেক সংস্থাই বের করেছে। তবে প্যানাসোনিক-এর 'ডি ভি ডি-এল ৫০' সত্যিই চমকপ্রদ। এত ছোট ডি ভি ডি প্লেয়ার এর আগে কেউ বের করেনি। আড়ে-দৈর্ঘ্যে ৫.৫১ × ৫.৯৬ ইঞ্চি। অন্যদের তুলনায় অন্তত ২ ইঞ্চি কম। ওজনেও অনেক হালকা। মাত্র ২.০৭ পাউন্ড। আর ব্যাটারির আয়ু প্রায় এক ঘণ্টা বেশি। পিকনিকে, পার্টিতে, এমনকী ট্রেনে, বাসে, বিমানেও সঙ্গে নিয়ে যেতে সুবিধে। দাম ১০৯৯ ডলার।

বিমল বসু

ব্যায়াম ও আপনার কিশোর সন্তান

প্রত্যেকের জীবনে কৈশোর এক বিশেষ সময়। এই সময়ে শৈশবের সারল্য একেবারে মুছে গিয়েছে অথচ যৌবনের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি। কেমন যেন এক ধোঁয়াটে অবস্থা। আসলে এই অবস্থার কারণ এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উত্তরণ। আসলে সময়টা একটি বৃক্ষ হয়ে ওঠার আগে যেন একটি বীজ।এই সময়ে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে অনেককিছুই পরিবর্তন ঘটে কারণ একটি শিশু এই সময় থেকেই বড় হয়ে উঠছে। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই সময় লম্বা হয়। বহু পেশি এই সময়ে যুক্ত হয়। আসলে বিভিন্ন জায়গার টিস্যুগুলিও এই সময়ে বাড়ে। এই সময় শরীরকে সুগঠিত করার জন্য শরীরের বেশি যত্ন নিতে হয়।

শরীরের এই অতিরিক্ত ওজনের চাহিদার জন্য অতিরিক্ত ক্যালরিসহ সঠিক খাদ্য খাওয়া দরকার। এই সময়ে ব্যায়াম একটি জরুরি জায়গা নেয়। এই সময়কার বদলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যায়াম শরীর ও মনের চাহিদা যোগায়। টিস্যু মাসল সঠিকভাবে সুগঠিত করার জন্য এই সময় শরীরে মেটাবলিক রেট বেড়ে যায়। এই মেটাবলিক রেট বেড়ে শ্বাসপ্রণালী ও রক্তচলাচলকে আরও জোরদার করে যাতে এই দুটি সিসটেম শরীরের যথাযথ চাহিদা পূরণ করতে পারে। বিশেষভাবে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম এই সময়কার সব পরিবর্তন ও পেশির চাহিদা পূরণ করতে পারে যাতে শৈশব থেকে যৌবনে পৌঁছতে কোনও অসুবিধে না হয়। আপনার কিশোর সন্তানটিকে সঠিক খাদ্য এবং সুপরামর্শ দিন যাতে এই পরিবর্তন সে স্বাস্থ্যকরভাবে নিতে পারে। এবং এর সঙ্গে অবশ্যই ব্যায়ামের সুফলের কথা বলতে ভুলবেন না। যদি সম্ভব হয় তাহলে বিশেষভাবে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম করাবেন।

দেহকে **সুঠাম** করতে!

হীরো
ম্যাজিক্যাল বডিজ
ফিটনেস মেশিনগুলির সাথে

হীরো জগার
দেহকে ফিট রাখতে ফাস্ট ট্র্যাক জগিং মেশিন। মূল বিপাকীয় ক্রিয়া যাকে বলে মেটাবলিজমের হার বাড়ে এবং বাড়তি ক্যালরী ক্ষয় করে।

হীরো অ্যালেগ্রো
হীরো আপনাকে শারীরিক দিক থেকে দারুণ ফিট রাখতে সাহায্য করে এর রোয়িং এবং সাইক্লি-এর টুইন ফাংশন দ্বারা।এতে শুধু আপনার হাত পায়ের পেশীই সবল হবেনা, আপনার হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ারও উন্নতি হবে।

হীরো স্টেপার
হীরো স্টেপার সিঁড়ি ভাঙা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার দেহ কাঠামোকে রাখে সুঠাম। এক কথায় যাকে বলে বাড়তি ক্যালরী দ্রুত ঝরিয়ে ফিট রাখে।

হীরো টুইস্টপ্রো
হীরো টুইস্টপ্রো ফিটনেস মেশিনের শেষ কথা। এতে আছে অনন্য রোয়িং, স্টেপিং ও টুইস্টিং ফাংশন যা আপনার নিতম্ব, জঙ্ঘা এবং কোমরের পেশীকে দৃঢ় করে। সব রকমের শারীরিক ফিটনেসের জন্য অতুলনীয়।

ম্যাজিক্যাল বডিজ ফিটনেস মেশিনের এই সম্ভার আপনি পাবেন সব বড় বড় স্পোর্টসের দোকানে এবং হীরো সাইকেল ডীলারদের কাছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন : ম্যাজেস্টিক অটো লিমিটেড, সি - 48, ফোকাস পয়েন্ট, লুধিয়ানা - 141010 ফোন : 670234 থেকে 670237, 674238 থেকে 674240 ফ্যাক্স : 91-161-672790 শাখা অফিস : নতুন দিল্লী ফোন : 3270269, 3274926, 3280263; মুম্বাই ফোন : 2833958, 2855561; কলিকাতা ফোন : 2251041; চেন্নাই ফোন : 4992830

মানুষের

২০ শতককে যদি বলা হয় কম্পিউটার সভ্যতার শতক, ২১ শতক তা হলে নিশ্চয়ই রোবট সভ্যতার যুগ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন রোবট তৈরি করা সম্ভব হবে, যা হার মানাবে মানুষের বুদ্ধিকেও। আলোচনা করেছেন সুব্রত রায়

মানুষের অনুভূতি কি বুঝতে পারবে আগামী শতকের যন্ত্রমানব

র বুদ্ধিকে হার মানাবে রোবট

কল্পনা করুন, আপনি 'লিভিং রুম'-এ বসে সন্ধেবেলা টিভি দেখছেন। কিংবা রান্নাঘরের স্ট্যাসে ও-বেলার শুক্তো 'মাইক্রোওয়েভ আভেন'-এ রান্না করে রাখছেন। এমন সময় আপনার চা এনে দিল ১৫০০ 'সার্ভো মোটর' লাগানো ছোট্ট এক রোবট। 'টুটেন খামেন'। বাজারে নতুন উঠেছে। আপনি দেশি রোবট কিনেছেন। জাপানি মডেল সবচেয়ে ভাল হলেও ভারতীয় জিনিসের কদর আলাদা। দামেও কম। ঘর পরিষ্কার এবং বাসন মাজা ছাড়াও টুটেন চা করা, কুকারে রান্না ইত্যাদি টুকিটাকি কাজ করে চমৎকার। ঘরের কাজ ছাড়া টুটেনের ছ' গিগাবাইট ক্যালকুলেটরে সংসারের ট্যাক্সের হিসেব, বাজার খরচ ও আরও অনেক ছোটখাটো অঙ্ক কষা যায়। টুটেন খামেন নামটা অবশ্য আপনার নিজেরই দেওয়া। কেনার পর পছন্দমতো দোকান থেকেই 'প্রোগ্রাম' করে দেওয়া।

ঠিক এরকমই একসময় আমাদের কল্পনা ছিল রোবট সম্পর্কে। রোবট এবং কম্পিউটারের যুগ্মশক্তিতে সবাই নাকি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারবেন। দেখা গেল, ব্যাপারটা আসলে অত সোজা নয়। রোবটকে নির্দিষ্ট নিয়মের বাঁধাধরা গণ্ডির বাইরে চালাতে গেলে প্রচুর গাণিতিক ও কারিগরি উৎকর্ষের দরকার। দরকার সাধারণ হিসেব-নিকেশের বাইরে 'ফাজি লজিক' জাতীয় বিশেষ গণিতের ব্যাপক প্রয়োগ। রোবটের বিভিন্ন মাত্রিক গতিকে মানবদেহের মতো স্বাভাবিক ছন্দে চালানোর পাশাপাশি তার বুদ্ধির ভাণ্ডারে নিজস্ব ভাবনার জিয়নকাঠির ছোঁয়া দেওয়া। বিশ শতকের শেষ অংশে এসেও বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনিয়ারদের প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে এই জোড়া সমস্যা। এত জটিলতা সত্ত্বেও 'রোভার' তৈরি করে অন্য গ্রহ-উপগ্রহের পিঠে চালানো, আগ্নেয়গিরির গর্ভে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে তথ্যসন্ধান করার মতো বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ সফল করা

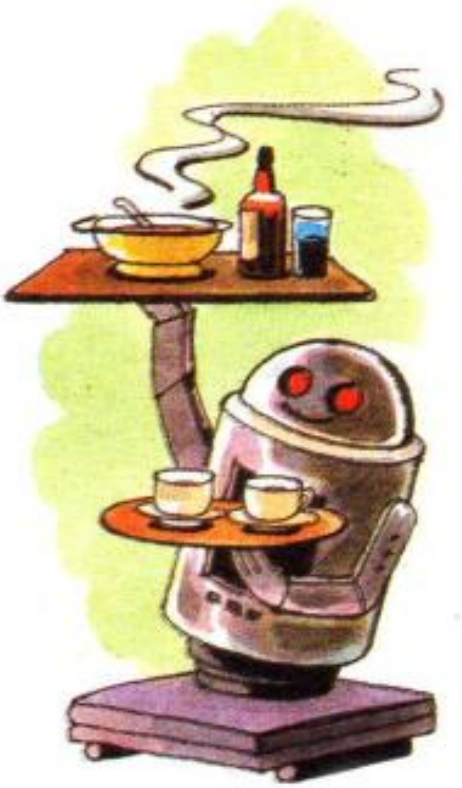

গেছে। অবশ্য সত্যিকারের মানবসঙ্গী তৈরি করা এখনও অসম্ভব। অদূর ভবিষ্যতে তা কতদূর সম্ভব হবে, বলা মুশকিল। তবে বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে বাস্তবের রোবট যতই জটিল হোক, কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কল্যাণে সায়েন্স ফিকশনের রুপোলি পরদায় তার চমক অসাধারণ। 'স্টার ওয়ারস' থেকে 'টার্মিনেটর টু', প্রোফেসর শঙ্কুর বিধুশেখর থেকে 'রোবো কপ'। টানা প্রায় সাত দশক ধরে চলছে কল্প রোবটের যুগ।

'রোবট' শব্দটি আসলে চেকোস্লোভাকিয়ার লেখক কারেল কাপেকের সৃষ্টি। ১৯২১ সালে তিনি 'আর.ইউ.আর' নামে একটি নাটক লেখেন। কারিগরি যন্ত্র তৈরির কোম্পানি 'রোজামস্ ইউনিভার্সাল রোবট' নিয়ে। চেক অভিধানে রোবট মানে বাধ্যতামূলক শ্রম। নাটকটি ইউরোপে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঁচ বছর পরে জার্মানির পরিচালক ফ্রিৎজ ল্যাং তাঁর সিনেমার জন্য ধাতুর চকচকে বর্মে ঢাকা এক মেয়ে-রোবটের সৃষ্টি করেন। 'মেট্রোপলিস' নামে এই সিনেমার এক বড় ভূমিকায় ছিল সেই যন্ত্রমানবী। সিনেমাটি প্রাণহীন শহুরে জীবনে 'স্কাইস্ক্র্যাপার'-এর নীচে গড়ে ওঠা যন্ত্রসভ্যতার ক্রীতদাস মানুষদের নিয়ে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম ও টেলিভিশন বিভাগের অ্যাসোশিয়েট প্রোফেসর জোনাথন কুনজের মতে, মেট্রোপলিস কেবল যন্ত্রসভ্যতায় মানবিক অবক্ষয়ের দিকটিই প্রমাণ করেনি। যন্ত্রকে মানুষে রূপান্তরিত করার ভয়াবহ পরিণতিও স্পষ্ট করেছে। বোলিং গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংস্কৃতির প্রোফেসর জ্যাক নাকবার-এর ভাষায় মেট্রোপলিস সিনেমা বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় সম্পূর্ণ অদেখা এক জগৎ উন্মোচন করেছে। নিউ ইয়র্কের রেন্সলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রোফেসর ডেভিড পোরুশ মনে করেন, মেট্রোপলিস থেকে সিনেমার কল্পজগতে যন্ত্রমানুষের ভাবতে পারার ক্ষমতার বিষয়ে এক নতুন তাত্ত্বিক প্রশ্ন উঠেছে। আগামী শতকের রোবট সভ্যতায় যন্ত্রমানুষটির শারীরিক কাঠামো সৃষ্টি করেছেন ল্যাং। তবে রোবটের ভাবনা ও মস্তিষ্কের হার্ডওয়্যার এখনও গবেষণার বিষয়। গত ৭০ বছরে রোবটের কাল্পনিক এবং বাস্তব রূপ খুব একটা বদলায়নি। ধাতুর বর্মে ঢাকা যান্ত্রিক শব্দ করা চলন্ত রোবট। মানুষকে অবিকল নকল করার প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে চলেছে ২১ শতকে। মেট্রোপলিস ছবির সৃষ্টি যখন হয়, তখন কম্পিউটার আদৌ কোনও উন্নত কাজ করত না। তাই তখনকার কল্পরোবটের সঙ্গে এখনকার কম্পুরোবটের পার্থক্য কল্পনা আর বিজ্ঞানের।

৫১ বছর আগে বাণিজ্যিকভাবে তৈরির জন্য প্রথম রোবটের 'পেটেন্ট' স্বীকৃত হয়। তারপর থেকে কয়েক হাজার রোবটের নতুন নকশা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে পৃথিবী জুড়ে। 'টেলিপ্রেজেন্স', 'ভারচুয়াল রিয়্যালিটি', 'ডিসট্যান্স লার্নিং' প্রভৃতি নতুন শব্দ এসেছে বিজ্ঞানের জগতে। এই উন্নতির ফলে দূর-নিয়ন্ত্রিত গাড়িকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে মানুষ ছাড়াই নিখুঁতভাবে চালানো যাচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি 'হামভি' বা 'হাই মোবিলিটি মালটিপারপাস হুইল্ড ভেহিক্ল' নামে এমন এক রোবট গাড়ি কেবল রণাঙ্গনেই নয়, রাজপথেও জনসাধারণের পথপ্রদর্শকের কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত দূর-নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির সামরিক উন্নয়নে রোবটবিজ্ঞান অভাবনীয় সুফল এনেছে। 'টোমাহক

কল্পবিজ্ঞান নয়, রোবট আজ হয়ে উঠেছে বাস্তব

মিসাইল' কিংবা অগ্নি, মঙ্গলের বুকে 'সোর্জনার' কিংবা পৃথিবীর অগ্নিগুহায় 'দান্তে'। সবেতেই কারিগরি উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়েছে। নাসার 'অফিস অব স্পেস অ্যাকসেস অ্যান্ড টেকনোলজি'র 'টেলিরোবোটিক্স' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার ডেভিড ল্যাভারের মতে অবশ্য এখনও সিনেমা ও কল্পবিজ্ঞানের প্রায়-মানুষ 'অটোমেটন'দের চেয়ে রোবট বিজ্ঞান অনেক যোজন পিছিয়ে। তবে অগ্রগতি অব্যাহত আছে। ম্যাকডোনেল ডগলাসের তৈরি 'শার্লট' সম্প্রতি এস টি এস-৬৩ মহাকাশযানে চড়ে শূন্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন। অভিযানের মহাকাশচারীদের 'ভিডিও ক্যামেরা' ব্যবহার এবং প্রচলিত 'সুইচ', বোতাম ও 'নব' ঘুরিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নিয়ন্ত্রণ করে প্রচুর সময় সাশ্রয় করেছিল শার্লট। এতে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীরা 'মার্স পাথফাইন্ডার' প্রকল্পটি সম্পূর্ণ রোবট-নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৯৭ সালে এই অভিযানে সোজর্নারের সাফল্য রোবটবিজ্ঞানে নতুন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল। এ-বিষয়ে যাওয়ার আগে বলে নেওয়া যাক রোবটের ইতিহাস।

পুরাণ থেকে কল্পবিজ্ঞান

রোবট কেবল এই শতকের আবিষ্কার বললে বেজায় ভুল হবে। যন্ত্রমানুষের ইতিহাস বহু প্রাচীন। তখন অবশ্য কেউ তাকে রোবট নামে ডাকত না। খ্রিস্টের জন্মের বহু আগে আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উন্নতি। এই সভ্যতার খবর লেখা আছে নিনেভের অসুরবনিপাল গ্রন্থাগারে, পাথরের গায়ে খোদাই করা লিপিতে। তাতে বলা হয়েছে, মহান দেবতা মর্দুক পরাজিত দেবতাদের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে মানুষের শরীর তৈরি করেন। জুডিও-খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, ভগবান পৃথিবীতে ধুলোমাটির ঢিপি তৈরি করে তাতে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করান। এভাবেই মানুষের সৃষ্টি। আর এক বর্ণনায় আছে, কাদার তাল দিয়ে প্রমিথিউস প্রথম মানব-মানবী তৈরি করেন। পরে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। মিশরীয় পুরাণে আছে, ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দেবতা খনুম কাদার তাল দিয়ে মানুষ তৈরি করেন। কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে দেবী হেদারের জাদুবলের ওপর নির্ভর করতে হয়। মাওরিদের উপকথায় বলে, সমুদ্রবালুকা দিয়ে প্রথম যন্ত্রমানব সৃষ্টি করে ভগবান নিশ্বাস

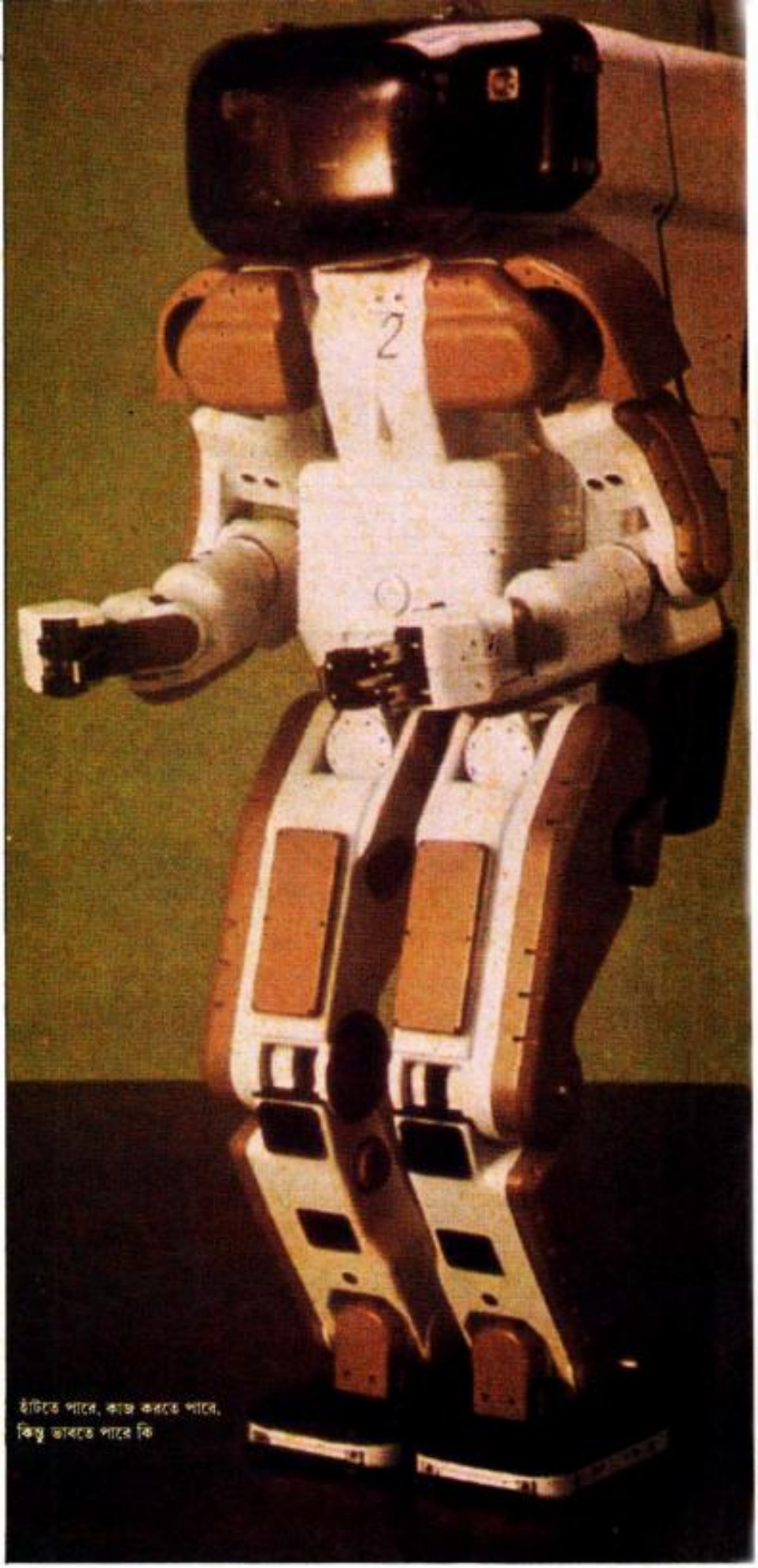

হাঁটতে পারে, কাজ করতে পারে, কিন্তু ভাবতে পারে কি

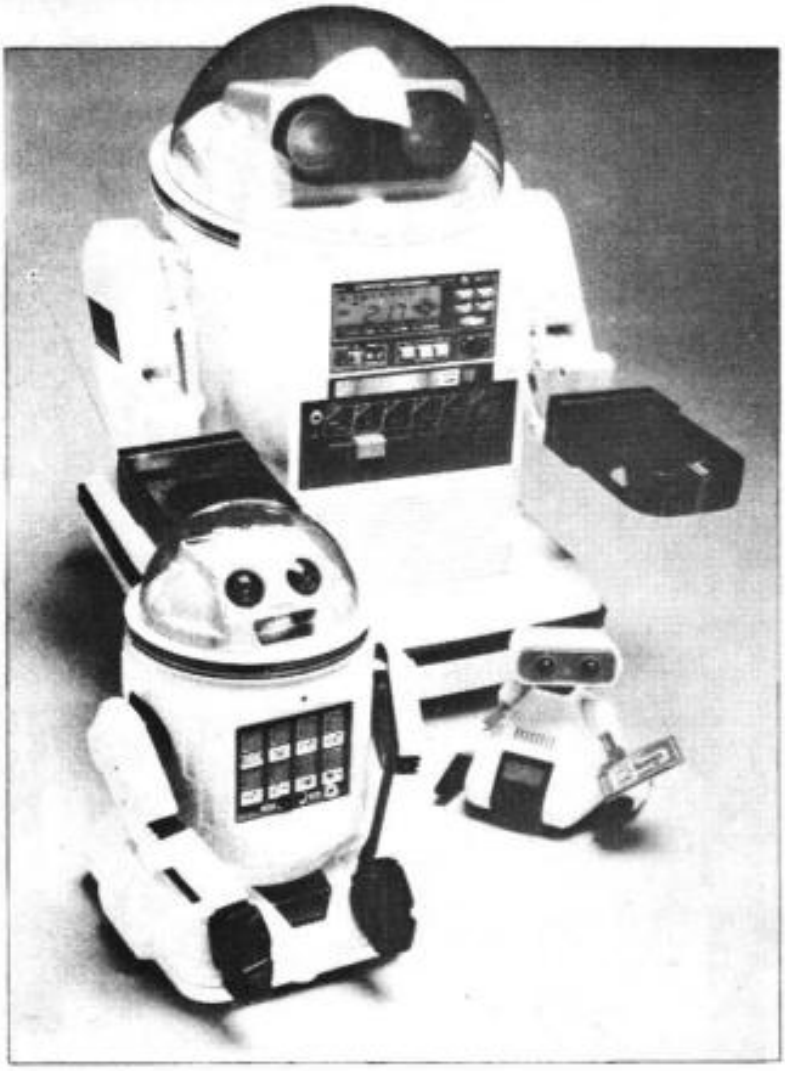

আইজাক আসিমভের লেখা থেকে উঠে আসা চরিত্রেরা

দিয়ে তাতে প্রাণবায়ু দেন। ভারতীয় ভগবৎ গীতায় বলা হয়েছে কীভাবে কারিগর এঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্মা কৃত্রিম যন্ত্রাংশ দিয়ে অপরূপা তিলোত্তমার সৃষ্টি করেছিলেন। ১১ শতকে পণ্ডিত রাজপুত্র ভোজ তাঁর 'সমরাঙ্গন সূত্রধর' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন যন্ত্র তৈরির বিস্তারিত বিবরণ দেন। এই গ্রন্থে তিনি জীবজন্তুর আকৃতির যন্ত্রের কথাও লিপিবদ্ধ করেন। সমসাময়িক রচনায় বলা হয়েছে, যন্ত্র হল পঞ্চভূতের অনুকরণ। তেজ যন্ত্রে যেমন আগুন সৃষ্টি হয়। অপ যন্ত্রে জল নিষ্কাশন চলে। মরুৎ যন্ত্রের গতিবিধি বাতাসের মতো। এই একই সময় রচিত বৃহৎকথাসরিৎসাগরে যান্ত্রিক 'হিউম্যানয়েড'দের কথা লেখা আছে। এরা নাকি কথা বলতে পারে, নাচতেও পারে। এই শতকের সেরা কল্পবিজ্ঞান লেখকদের অন্যতম আইজ্যাক আসিমভ মানুষের উপকারী বুদ্ধিমান রোবটের কথা শুনিয়েছেন। তাঁর লেখা ছোটগল্প 'যুক্তি'-তে তিনি জানিয়েছেন 'কিউটি' নামে এক অটোমেশনের কথা। কিউটির চোখে মানুষ হল নরম মোটাসোটা প্রাণী, যারা শক্তির জন্য স্থূল মানের জারণ প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা, বাতাসের চাপ, আর্দ্রতা বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সামান্য হেরফের হলেই দ্রুত বিবর্তনে অপটু মানুষ নেতিয়ে পড়ে। কিউটির দায়িত্ব এমন ম্রিয়মাণ মানুষদের সেবা করা। আসিমভের লেখা 'হ্যান্ডবুক অব রোবোটিকস, ৫৬তম সংস্করণ, ২০৫৮ সাল' বইয়ে তিনি রোবট জীবনের তিনটি মূল সূত্র বিবৃত করেছেন। সেগুলি বুদ্ধিমান যন্ত্রের আইন নামে বিশেষ পরিচিত। আসিমভের আইন অনুসারে (১) রোবটরা কখনও মানুষের ক্ষতি করবে না। মানুষকে আঘাত করবে না। কিংবা না জেনে মানুষকে বিপদের মুখে ফেলবে না। (২) প্রথম সূত্র বিঘ্নিত হয় এমন নির্দেশ ছাড়া রোবট মানুষের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে। এবং (৩) প্রথম দুটি সূত্র বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা না দিলে রোবট সর্বদা নিজের অস্তিত্ব অটুট রাখার চেষ্টা করবে।

বোঝাই যাচ্ছে আসিমভ মানুষকে রোবটের থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলে নিরূপণ করেছেন। মানুষ কেবল খাদ্য গ্রহণ ও বংশবৃদ্ধি করে সম্পূর্ণ হয় না। মানুষ ভাবতে পারে। উন্নত মতাদর্শের ভাবনা কেবল মানুষ ছাড়া অন্য জীবের আছে কিনা এ-কথা জানা নেই। রোবটের সঙ্গে মানুষের ফারাক এই চিন্তার জগতে। রোবটকে অঙ্ক দিয়ে উন্নত ইলেকট্রনিক চিপ্‌সের সাহায্যে মানুষের মতো করা যেতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে উন্নত চিন্তা করার ক্ষমতা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা সে ভাবনার হিসেব-নিকেশ এখনও আমাদের অজানা। বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ দার্শনিক রজার পেনরোজের মতে, নীতিজ্ঞান ও উচিত-অনুচিত বোধ 'টপোলজি'র অঙ্কে সার্বিকভাবে প্রকাশ করা গেলেও চেতনা শব্দটি বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে। এখনও তার রহস্যের হদিস মেলেনি। সেজন্য দরকার অন্য ধরনের জ্ঞান। তা বলে যন্ত্রের জটিলতা অবশ্য মানুষের চেয়ে কিছু কম নয়।

রোবটের শ্রেণীভেদ

জাপানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট অ্যাসোসিয়েশন (JIRA) যান্ত্রিক জটিলতার নিরিখে রোবটকে

ছ'টি ভাগে ভাগ করেছে। এই ভাগগুলি হল : (১) কায়িক শ্রম করার সাধারণ যন্ত্র, (২) কোনও জিনিস তোলা এবং রাখার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র, (৩) বিভিন্ন অনুশীলন চালানোর 'ম্যানিপুলেটর', (৪) হাতে-কলমে কাজ শেখানো যাবে এমন যন্ত্র, (৫) নির্দেশাবলী দিয়ে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন বস্তু, এবং (৬) যে ধরনের যন্ত্র নিজেই পরিবেশ বুঝে নিজেকে চালনা করতে পারে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা অবশ্য জাপানিদের প্রথম দুটি রোবট শ্রেণীকে আমল দিতে চান না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদেরও মত এক। ব্রিটিশ রোবট অ্যাসোসিয়েশন (BRA) এবং রোবট ইনস্টিটিউট অব আমেরিকা (RIA)-র সংজ্ঞা অনুযায়ী রোবট হল ``a reprogrammable device designed to both manipulate and transport parts, tools, or specialized manufacturing implements through variable programmed motions for the performance of specific manufacturing tasks.'' 'রিয়া' অবশ্য 'রিপ্রোগ্রামেবল ডিভাইস'-এর বদলে 'মালটিফাংশনাল ম্যানিপুলেটর' কথাটিই ইদানীং বেশি পছন্দ করছে।

কেবল যান্ত্রিক জটিলতাই নয়। রোবটের বুদ্ধিমত্তারও ভাগ আছে। 'স্টার ট্রেক : দ্য নেক্সট জেনারেশন' নামে বিদেশের এক দারুণ জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালে অ্যানড্রয়েড ডেটার বিখ্যাত উক্তি ছিল, "উই আর মোর অ্যালকহলিক দ্যান ইউ থিঙ্ক। ইফ ইউ প্রিক মি, ডোন্ট আই নট-লিক?" কমাণ্ডার ডেটার বক্তব্য অ্যানড্রয়েডের সঙ্গে মানুষের মিল কম নয়। তাদের 'শরীরে' খোঁচা দিলেও 'রক্ত' নিঃসরণ হয়। ঠিক মানুষের যেমন। অ্যানড্রয়েডের রক্ত অবশ্য কলকব্জা মসৃণভাবে চলার জন্য প্রয়োজনীয় তরল। মানুষের রক্তের চেয়ে আলাদা। তবু ডেটার উক্তির অন্য একটা আঙ্গিক আছে। সেই আঙ্গিকটিকে সফল করার জন্য কম্পিউটারবিজ্ঞানী, রোবট বিশারদ ও গণিতজ্ঞরা একযোগে কাজ করছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স'। অতীতকে স্মরণ করার ক্ষমতার পাশাপাশি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের ত্রুটি সংশোধন করা। সত্যকে লব্ধজ্ঞান হিসেবে আবিষ্কার করা। এবং জীবনের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া। মোটামুটি এই কয়েক ধাপে যন্ত্র থেকে প্রায়-মানব স্তরে উত্তরণ সম্ভব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিজ্ঞানে গবেষকরা প্রথম ধাপে ইতিমধ্যে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। ১৭২৬ সালে ছাপা 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স' নামে বিখ্যাত গল্পের লেখক জোনাথন সুইফ্‌ট 'লাপুটা দ্বীপে যাত্রা' নামে একটি অধ্যায়ে ২০ বর্গফুট মাপের এক ভাবুক যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। সাহিত্যিকের কল্পনা যন্ত্রকে ভাবুক ভাবলেও এই গত দশকেও বিজ্ঞানীরা রোবটের মগজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ১৯৮২ সালে 'কম্পিউটিং' নামে এক বিখ্যাত জার্নালে আই বি এম রিসার্চ বিভাগের ডেভিড গ্রোসম্যানের উক্তি উদ্ধৃত করে একটি প্রবন্ধে লিসা মেণ্ডেলসন লিখেছেন, এখনকার সবচেয়ে চালাক রোবটটি কিছুতেই গঙ্গাফড়িং-এর বেশি বুদ্ধিমান নয়। সেটা অবশ্য ১৬ বছর আগের অভিমত। এর পর থেকেই আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে।

রোবট যখন খেলার সঙ্গী

মোটামুটি তিন পর্যায়ে রোবটের বুদ্ধিকে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়কে রোবটবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'জিরোথ লেভেল অব ইনটেলিজেন্স'। এই শ্রেণীর রোবটের কাজ বাঁধাধরা শিক্ষাগ্রহণ ও তার পুঁথিগত ব্যবহার। অনেকটা তোতাপাখির শেখা বুলির মতো। আটের দশকের শতকরা ৮০ ভাগ যন্ত্রই ছিল এই পর্যায়ের। ঝালাইয়ের কাজ ও মালপত্র ওঠানো নামানোর জন্য এই পর্যায়ের বুদ্ধিমান যন্ত্রের ব্যবহার চলে। এদের সত্যিই গঙ্গাফড়িং-এর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলা চলে না। ঠিক যে ধরনের মাপে ঝালাই করতে শেখানো হয়েছে বা যেখান থেকে মালপত্র

১৯৯২ সালের শেষভাগে 'দান্তে' নামে একটি রোবটকে অ্যান্টার্কটিকার আগ্নেয়গিরি মাউন্ট ইরিবাসের ভূগর্ভে লাভার সন্ধানে পাঠানো হয়। ইরিবাসের মতো জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ভেতরে কোনওভাবেই মানুষের প্রবেশ সম্ভব নয়।

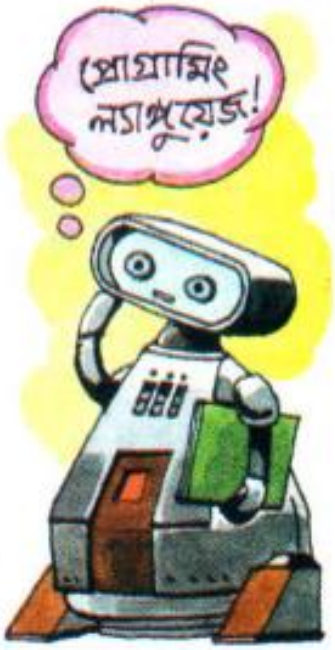

তোলা বা নামানো হবে তার আকার বা অবস্থান সামান্য বদল হলেই এই শ্রেণীর রোবটের বেজায় মুশকিল। কিছুতেই এরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের রোবট বেশ উন্নত। নতুন ধরনের 'প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ' দিয়ে এদের চালানো হয়। নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে যে-কোনও শিখিয়ে দেওয়া কাজ এরা নিজেরাই করতে পারে। জাপানের PLAW নামে বিশেষ কম্পিউটার-ভাষা ছাড়াও 'ভ্যাল' প্রভৃতি একডজন মেশিন-ভাষায় এই শ্রেণীর রোবট চালানো যায়। আটের দশকের শেষ থেকে নয়ের দশকের সূচনা অবধি অধিকাংশ রোবটই দ্বিতীয় পর্যায়ের।

তৃতীয় ধারার রোবট সম্পর্কে কিছু বলার আগে বুদ্ধি ও অনুভূতির পার্থক্য চেনা দরকার। জার্মান কবি ও নাট্যকার জোহান গ্যেটে বলেছিলেন, বুদ্ধিমান মানুষ প্রায় সব কিছুকেই হাস্যকর মনে করে। অথচ অনুভূতিশীল মানুষ প্রায় কোনও কিছুকেই হেসে উড়িয়ে দেয় না। অ্যানড্রয়েড জাতীয় প্রায়-মানুষ রোবটদের সম্পর্কেও এই কথা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গণিতে চেতনার ভাষা প্রকাশের চেষ্টা করছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুজ বল প্রোফেসর রজার পেনরোজ। 'দ্য এম্পারার্স নিউ মাইন্ড' বইয়ে তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়েছেন তাঁর গবেষণার সিদ্ধান্ত। প্রচলিত কম্পিউটার যত অঙ্কই কষুক, সে কখনও চেতনার রং খুঁজে পাবে না। গণিতজ্ঞ এলান টারিং-এর নামানুসারে সৃষ্টি টারিং মেশিন জাতীয় বর্তমান 'ডিজিটাল কম্পিউটার' দিয়ে যেভাবে হিসেবনিকেশ করা হয়, তাতে মনের ভাবনা কিছুতেই ধরা সম্ভব নয়। পেনরোজের এই মন্তব্যের পরে ১৯৯৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেনার্ড অ্যাডেলম্যান এক চামচ ডিএনএ ব্যবহার করে প্রথম 'মলিকিউলার কম্পিউটার' সৃষ্টি করেন। মলিকিউলার কম্পিউটার টারিং মেশিন নয়। তাই তাতে চেতনার অঙ্ক কষা সম্ভব হবে কি না এখনও অজানা। তৃতীয় পর্যায়ের রোবট অনুভূতিসম্পন্ন কিছু কাজকর্ম করতে পারে। তাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা আছে। যাকে পরিভাষায় বলে 'আর্টিফিশিয়াল রিজনিং'। টারিং মেশিনে তৃতীয় ধাপের রোবটগুলি কেবল প্রোগ্রাম করা যুক্তিতে চলে। ভবিষ্যতে মহাশূন্যে অজানা অভিযানে এই উন্নত স্তরের রোবটই ব্যবহার করা হবে। বলা বাহুল্য, এরা যন্ত্র। অ্যানড্রয়েড নয়।

জলে স্থলে আকাশে

রোবটকে মহাশূন্যে পাঠানোর আগে জলে নামানো দরকার। অনেকটা পরীক্ষামূলকভাবে। ঠিক যেমন অ্যাস্ট্রোনট, কসমোনটেরা মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার আগে জলের নীচে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে শূন্য মাধ্যাকর্ষণের অভ্যাস করেন। কলেজ পার্ক ম্যাডিসনের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডে ১৭ লক্ষ ডলার ব্যয়ে তৈরি হয়েছে নিউট্রাল বায়োয়েন্সি রিসার্চ ফেসিলিটি। এই গবেষণাগারের জলাধারে প্লবতার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে নিমজ্জিত বস্তুর ওপর মাধ্যাকর্ষণের মান প্রায় শূন্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। সেখানে গভীর জলের নীচে ইদানীং মহাকাশ টেলিরোবোটিক গবেষণার কাজ চলছে। ২৫ ফুট গভীর ৫০ ফুট ব্যাসের সুইমিং পুলটিতে ৩৬৭০০০ গ্যালন জল ধরে। তাতে রোবটের বিভিন্ন অংশ নামিয়ে তাদের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। নাসার পক্ষ থেকে এই কাজে যথেষ্ট সহায়তা করা হচ্ছে। সুইমিং পুলের ট্যাঙ্কের ধারে বড়-বড় কাচের ঢাকনা ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ লাগানো। একটি রোবট ক্যামেরা ও রোবো ক্রেনের সাহায্যে জলাধারটিকে পরিচালনা করা হয়।

কেবল জলাশয়ে নয়, আগুনের মধ্যেও রোবটের অস্তিত্ব। কার্নেগি মেলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স ইনস্টিটিউট হল পিটস্‌বার্গে। ১৯৯২ সালের শেষভাগে 'দান্তে' নামে একটি রোবটকে অ্যান্টার্কটিকার আগ্নেয়গিরি মাউন্ট ইরিবাসের ভূগর্ভে লাভার সন্ধানে পাঠানো হয়। ইরিবাসের মতো জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ভেতরে কোনওভাবেই মানুষের প্রবেশ সম্ভব নয়। এ-কাজে দান্তের অবদান অপরিসীম। অবশ্য তথ্য সংগ্রহের সময় অত্যধিক উত্তাপে 'ফাইবার অপটিক কেবল' ছিঁড়ে গিয়ে রোবটের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়। পরে বহু চেষ্টায় দান্তেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পটিতে নাসার ব্যয় হয় ২০ লক্ষ ডলার। তুলনায় পরবর্তী দান্তে অভিযান অনেক বেশি সফল ও কম খরচের। ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে আট পাওলা প্রতিভাধর রোবট দান্তে-টু-কে

আলাস্কার অগ্নিগর্ভ মাউন্ট স্পার-এর গহ্বরে নামানো হয়। ১০ ফুট বাই আট ফুট আয়তনের ১৭০০ পাউন্ড বা প্রায় ৭৭০ কিলোগ্রাম ওজনের এই রোবটটি সূক্ষ্ম 'সেন্সর ভিডিও ক্যামেরা' এবং বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ নিয়ে স্পারের গভীর থেকে নানা গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে আনে। দান্তে-টু মিনিটে সবচেয়ে বেশি এক মিটার যেতে পারে। এই রোবটের গতিবিধি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ ও ইন্টারনেট তথ্য সড়ক মারফত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাই দান্তের সাফল্য চাঁদ বা মঙ্গলের পিঠে নিখুঁতভাবে রোবট পরিচালনা করার কাজে বিরাট সুখবর।

মহাকাশে গবেষণাতেও রোবটের অবদান প্রচুর। ১৯৯৩ সালে 'স্পেস রোবট টেকনোলজি এক্সপেরিমেন্ট' (রোটেক্স) প্রথম রোবট-নিয়ন্ত্রিত মহাকাশ অভিযান সম্পূর্ণ করে। জার্মান কারিগরি কৌশলে তৈরি 'রোটেক্স স্পেসল্যাব ডি-টু মিশন'-এ চড়ে মহাশূন্যে পাড়ি জমায়। বিভিন্ন সেন্সরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহার করে রোবটটি মহাশূন্যে ভেসে যাওয়া একটি বস্তুকে নিখুঁতভাবে ধরে ফেলে। এ ছাড়া টুকরো অংশ জোড়া লাগিয়ে কাঠামো গঠনের কাজেও রোটেক্স সফল হয়। বলা বাহুল্য, মহাকাশে রোবটের এসব কাজকর্ম পৃথিবীর মাটিতে কন্ট্রোল রুমে বসে পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায় আরও রোমাঞ্চকর। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ডেলটা রকেটে চেপে 'পাথফাইন্ডার মিশন' মঙ্গলের পথে পাড়ি জমায়। সাত মাস শূন্যে উড়ে ১৯৯৭ সালের ৪ জুলাই এক বিশেষ অর্থ সাশ্রয়কারী পদ্ধতিতে গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে 'প্যারাশুট রকেট' ও বাতাস-ব্যাগের সাহায্যে নিরাপদে লাল গ্রহের মাটি স্পর্শ করে। পরদিন ৫ জুলাই ক্যালিফোর্নিয়ার রাত ১০ টা ৫০ মিনিটে পাথফাইন্ডার মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে মঙ্গলে নামে 'রোভার সোজর্নার'। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের দামাল অধ্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ সংস্কারক ইসাবেলা ভ্যান ওয়েগনারের জনপ্রিয় ছদ্মনাম ছিল সোজর্নার ট্রুথ। বাংলায় বলা যায় 'পরিব্রাজক সত্য'। ইসাবেলার নামানুসারে ২৫ পাউন্ড ওজনের ছ'চাকাওলা মাইক্রোরোভারটির নাম রাখা হয় সোজর্নার বা পরিব্রাজক। 'আলট্রা প্রোটন এক্স রে স্পেকট্রোমিটার' ব্যবহার করে ফোটো তোলা 'লেসার ইমেজিং'-এর জন্য ইমেজার ফর মার্স পাথফাইন্ডারের ব্যবহার প্রভৃতি ছাড়াও যোগী ভালুক, বার্নাকল বিল, কাসপার, কাউচ ইত্যাদি ছোট-বড় পাথর ডিঙিয়ে নিজস্ব বুদ্ধিতে প্রায় একমাস অজস্র কাজ করল সোজর্নার। মঙ্গলের ঐতিহাসিক পাথফাইন্ডার অভিযানে রোবটের সাফল্য এক নতুন নজির সৃষ্টি করল। সোজর্নারের পাঠানো ফোটো থেকে ভূতাত্ত্বিকরা ১০০০ মাইল চওড়া কয়েকশো ফুট গভীর এক কোটি বছর আগেকার জলস্রোতের প্রমাণ পেয়েছেন। এখন মঙ্গলে জল নেই। তবে প্রাচীন প্লাবনের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

আগামী ২১ শতকে সৌরজগতের গণ্ডি পেরিয়ে মহাশূন্যে পাঠানো রোবটের সংখ্যা বহু গুণ বাড়বে। নতুন শতকে পা দেওয়ার আগে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে মঙ্গলের পথে পাড়ি জমিয়েছে 'ডিপ স্পেস-টু'। তাতে আছে বাস্কেটবলের আকৃতির এক বিশেষ পাতের তৈরি বল যা মঙ্গলের মাটিতে পড়েই ফেটে যাবে। ভেতর থেকে আসবে

লিপস্টিকের মতো দেখতে এক 'মাইক্রোপ্রোব'। এই অতিক্ষুদ্র 'রোবো ডিটেকটিভ'-এর কাজ হবে মঙ্গলের মাটিতে ছ'ফুট গভীর সুড়ঙ্গ ফুঁড়ে সেখানে জল আছে কি না দেখা। মঙ্গলে জল থাকা মানেই সেখানে মানুষের বসতির সম্ভাবনা। ফেব্রুয়ারি মাসে পরপর ঘটেছে দুটি ঘটনা যা কল্পবিজ্ঞানকেও হার মানায়। সেসময় পৃথিবীর ২৪ কোটি মাইল দূর দিয়ে উড়ে যাবে 'অ্যাস্টেরয়েড ইরোস'। এই ২৫ মাইল লম্বা পাথুরে অ্যাস্টেরয়েডের কক্ষপথে পাক

শিশুরা এলোমেলোভাবে হাত নাড়াতে নাড়াতে স্পর্শের বিভিন্ন সূক্ষ্ম মাত্রা শেখে। 'ইনফ্যান্ট' নামে একটি রোবটের হাতের শেখার ধরন শিশুদের মতো। নিজেই নিজের ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়ার চমকপ্রদ 'লজিক' বিন্যাস আছে ইনফ্যান্টের কম্পিউটার মগজে।

দেওয়ার জন্য ১৯৯৬ সালে পাঠানো হয়েছে মহাকাশযান 'নিয়ার'। পুরো কথা 'নিয়ার আর্থ অ্যাস্টেরয়েড রঁদেভু'। টানা একবছর ইরোসের গায়ে পাক খেয়ে সেই ভূখণ্ডটির গঠন ও রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর নেবে নিয়ার। তারপর নিখুঁত সময় বুঝে অ্যাস্টেরয়েডের বুকে নামানো হবে তাকে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই আর-এক মহাকাশযান 'স্টার ডাস্ট' ছুটেছে মহাশূন্যে। উদ্দেশ্য 'ওয়াইল্ড-টু' নামে এক ধূমকেতুর পুচ্ছ থেকে ধুলো সংগ্রহ। ওয়াইল্ড-টু'র-৯৩ মাইলের মধ্যে পৌঁছে রোবট আর্মের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণ ধুলো সংগ্রহের পর স্টার ডাস্ট পৃথিবীর অভিমুখে যাত্রা করবে। ২০০৬ সাল নাগাদ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধূমকেতুর ধুলোসমেত একটি বাক্স বা 'ক্যাপসুল' প্যারাশুটে চড়ে নেমে আসবে মাটিতে। বিজ্ঞানীরা সেই পরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। ধূমকেতুর পুচ্ছে ধুলোর জটের মধ্যে জৈব পদার্থে সৌরজগৎব্যাপী প্রাণের উৎস ছড়িয়ে আছে। এমন ধারণা সত্য হলে সৌরজগতের সৃষ্টি ও জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কিছু তত্ত্বের প্রমাণ মিলবে। মহাকাশে রোবটের প্রকল্প এখানেই শেষ নয়। ২০০৩ সালে প্রস্তাব আছে ইউরোপা অভিযানের। বৃহস্পতি গ্রহের এই রহস্যময় উপগ্রহে বরফের চকচকে আস্তরণের গায়ে ফুটিফাটা দাগ। বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান লেখকদের বহুদিন স্বপ্নে ভাসিয়েছে সেই বরফ ফাটলের নীচে জলের সম্ভাবনা। সম্প্রতি গালিলেও মহাকাশযানের পাঠানো ফোটো মারফত সেই ফাটলের নড়াচড়া নজরে এসেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পাঁচ থেকে ১০ মাইল পুরু বরফের নীচে প্রায় ৪০ মাইল গভীর উষ্ণ জলের সাগর আছে। সেখানে সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরি থেকে ক্রমাগত অগ্ন্যুৎপাতে খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ জলে অজানা জীবের উদ্ভব সম্ভব। সেই আশা নিয়ে 'ইউরোপা ল্যান্ডার' নামে মহাকাশযানটি উপগ্রহের বরফে নামবে। তারপর একটি ছোট্ট রোবট সাবমেরিন ফাটলের মধ্যে নামিয়ে পরীক্ষা করা হবে ইউরোপার সমুদ্রে জীবনের অস্তিত্ব। ঠিক যেভাবে মঙ্গলের মাটিতে সোজর্নার রোভারের চোখ বা ক্যামেরায় পৃথিবীতে বসে আমরা যোগী, সার্ফ এবং বার্নাকল বিলের ফোটো দেখেছি, সেভাবেই ইউরোপার চোরা সমুদ্রে প্রাণের সন্ধান করব। নাসার অধিকর্তা ড্যানিয়েল গোল্ডিনের ভাষায়, ইউরোপায় জীবন আছে কি না, আমরা জানি না— থাকলেও তা কোন স্তরের প্রাণ বলা মুশকিল। তবে সেখানে কেবল প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই হবে ২১ শতকের অন্যতম সেরা আবিষ্কার।

পরম আঙুলের খোঁজে

জন হপকিন্স মেডিকেল স্কুলের 'নিউরোফিজিওলজিস্ট' কেনেথ জনসন এবং সহকর্মী স্টিভেন সিয়াও ১৯৯২ সালে অ্যানুয়াল 'রিভিউ অব নিউরোসায়েন্স'-এ এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। বিষয়, মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে বস্তুর আকার ও 'টেক্সচার'থেকে আন্দাজ করতে পারে বস্তুটি কী। দেখা গেছে, চোখে যেমন আলো সংগ্রাহক অনুভূতি কোষ 'রেটিনা' ছড়ানো আছে, ঠিক তেমনই আঙুলের মাথায় এবং গায়ে দ্বিমাত্রিক উপরিতলে চামড়ার নীচেই আছে একধরনের অনুভূতি সংগ্রাহক 'নিউরোন'। এদের নাম 'স্লোলি অ্যাডাপটিং-ওয়ান' (এস এ-ওয়ান) সিস্টেম। উদাহরণ হিসেবে আবছা আলোতে 'স্ক্রু-ড্রাইভার' ব্যবহার করার কথা ধরা যাক। কম কম্পাঙ্কের কোনও কম্পন হয়তো বলে দেবে স্ক্রু-ড্রাইভারটি স্ক্রুর মাথায় কাটা ঘাটে ঠিকমতো বসেছে কি না। এই ধরনের কম্পন নিউরোন থেকে মগজ জানতে পারে। আরও এক ধরনের নিউরোন প্রচুর পরিমাণে আঙুলের গায়ে ছড়ানো থাকে। এদের বলে 'র‍্যাপিডলি অ্যাডাপটিং সিস্টেম'। সংক্ষেপে (আর এ-ওয়ান)। এস এ-ওয়ান এর তুলনায় আর এর অনুভূতি সংবহন করার সমতা এক তৃতীয়াংশ। তবু সংখ্যায় এরা অনেক বেশি। তাই বিভিন্ন বিন্দুতে আর এ-র অনুভূতির ব্যবধান থেকে মস্তিষ্ক বুঝতে পারে হাতে ধরা বস্তুটি পিছলে যাচ্ছে কি না। কিংবা বস্তুটির আকার পরিবর্তনশীল কি না, জীবন্ত কোনও কিছু ধরলে আর এ সমষ্টি সম্ভবত এক স্পন্দন অনুভব করে মস্তিষ্ককে জানায়। জনসন এবং সিয়াও দেখালেন এস এ-ওয়ান আর এ ছাড়াও আর এক ধরনের অনুভূতিবাহী কোষ আছে আঙুলের মাথায়। এদের বলে পেনিসিয়ান সিস্টেম। বিশেষ ঢাকনা দেওয়া বলে এরা কম কম্পাঙ্কের শব্দ পায় না, কেবল উচ্চ কম্পাঙ্কের খবরই এরা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। স্ক্রু-ড্রাইভারটি স্ক্রুর ঘাটি থেকে ফসকে গেলে তার খবর বলে দেয় পেনিসিয়ান।

ছবি : দেবাশিস দেব

বিশাল এই ভারতবর্ষে ধর্মের বৈচিত্র্যও বিশাল। পৃথিবীতে সম্ভবত আর কোনও দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে পাশাপাশি এত বিচিত্র ধর্মের মানুষের বাস। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মের মানুষ আছে ভারতে। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের তো জন্মই হয়েছে এদেশে। জৈনধর্ম সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পৃথিবীর আর এক প্রাচীন ধর্ম জরথুস্টবাদও প্রভাবিত করেছে এদেশের অসংখ্য মানুষকে। এবং বিচিত্র এই ধর্মগুলির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অসংখ্য বর্ণময় অনুষ্ঠানও। হোলি, দীপাবলি, বা দশেরার মতো জনপ্রিয় উৎসব ছাড়াও আছে আরও নানা উৎসব-অনুষ্ঠান, যেগুলিকে বাদ দিয়ে ভারতীয়দের ধর্মীয় জীবনের কথা ভাবাই যায় না। এখানে তেমন কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানব আমরা।

● শিবরাত্রি অনুষ্ঠানটি হয় প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ। মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যের অনুসঙ্গ মিশে আছে এই উৎসবের সঙ্গে। যাঁরা শিবের উপাসক, তাঁরা এদিন উপবাস করেন, শিবের মাথায় জল দেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে মিছিলও বেরোয়।
● গঙ্গৌর অনুষ্টানটি রাজস্থানেই বেশি-দেখতে পাওয়া যায়। এটিও শিব-পার্বতীর মহিমাজ্ঞাপক উৎসব। রংচঙে পোশাক পরে মেয়েরা নাচগান করেন এই উৎসবে।
● বর্ষার আগমন সূচিত করে রাজস্থানেরই আর এক উৎসব তিজ। এই উৎসবের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে দেবী পার্বতীর অনুসঙ্গ। দেবী পার্বতীর মূর্তি নিয়ে বেরোয় বর্ণাঢ্য মিছিল, মেয়েরা গান করেন ও নাচেন এই মিছিলে।
● নাগ পঞ্চমী হল অনন্তনাগের পুজো। বিষ্ণু যে মহাসর্পের কুণ্ডলীর ওপর আসীন, সেই হল অনন্তনাগ। জুলাই-অগস্ট মাসে এই উৎসব হয়। সাপুড়েরা এই উৎসবে বড় ভূমিকা নেন। মানুষ বিশ্বাস করেন যে সর্পদেবতাকে তুষ্ট করলে অমঙ্গলের আশঙ্কা কমে, এই বিশ্বাস থেকেই এই উৎসবের উৎপত্তি।
● দ্রুকপা তেশি একটি বৌদ্ধ উৎসব। তথাগত বুদ্ধের প্রথম ধর্মশিক্ষা দেওয়ার দিনটিতে এই উৎসব হয়। অগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব।
● ত্সো পেমাও এক বৌদ্ধ অনুষ্ঠান। ১২ বছর অন্তর এই উৎসব হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হিমাচল প্রদেশের রেওয়ালসার হ্রদে যান। সেখানে উৎসবে যোগ দেন দালাই লামা। রেওয়ালসার হ্রদ পরিক্রমা এই উৎসবে এক বড় আকর্ষণ।
● মিলাদ-উন-নবি হল হজরত মহম্মদের জন্মদিনটিকে উদ্‌যাপন করার উৎসব।
● শিখগুরু গোবিন্দ যেদিন খালসা পত্তন করেন, সেই দিনটির স্মরণে হয় বৈশাখী উৎসব।

আমাদের এবারের কুইজ জুড়েও কেবল উৎসব আর উৎসব।

---

(১) অন্ধ্রপ্রদেশে যে উৎসবকে মকর সংক্রান্তি নামে ডাকা হয়, তামিলনাড়ুতে তার নাম কী?
(২) কোন জনপ্রিয় ভারতীয় উৎসবের আর এক নাম রংপঞ্চমী?
(৩) শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে নারিকেল পঞ্চমী অনুষ্ঠান হয়। এটিকে আমরা কী নামে চিনি?
(৪) কোন বৌদ্ধ অনুষ্ঠানকে ডাকা হয় সাগা দাওয়া নামে?
(৫) কোন মুসলিম অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় আব্রাহামের পুত্রের বলিদানের স্মরণে?
(৬) বছরের অন্যতম পুণ্য তিথিতে হয় এই অনুষ্ঠান। মনে করা হয়, এই দিন চাঁদের দিকে তাকালে অমঙ্গল হবে। কী নাম অনুষ্ঠানটির?
(৭) মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে কোন অনুষ্ঠান হয়?
(৮) শ্রীকৃষ্ণের মাসির বাড়ি যাওয়া উপলক্ষে উদ্‌যাপিত হয় কোন উৎসব?
(৯) দীপাবলির ঠিক আগে স্বামীদের মঙ্গলকামনায় কোন অনুষ্ঠান করেন বিবাহিত মহিলারা?
(১০) পশ্চিমবঙ্গের দীপাবলি উৎসব কালীপুজোর সঙ্গে সংযুক্ত। মুম্বইয়ে এটি কোন দেবীর উৎসব?

প্রশ্নের উত্তর

(১) পোঙ্গল।
(২) হোলি।
(৩) রাখী বন্ধন।
(৪) বুদ্ধ জয়ন্তী।
(৫) ইদুজ্জোহা।
(৬) গণেশ চতুর্থী।
(৭) বসন্ত পঞ্চমী।
(৮) রথযাত্রা।
(৯) করবা চৌথ।
(১০) লক্ষ্মী।

এ পক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিন এবং
আকর্ষনীয় পুরস্কার
জিতুন
অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কোন অনুষ্ঠান হয় পবিত্র এক প্রাণীকে কেন্দ্র করে?

উত্তর পাঠাবার ঠিকানা:
'আনন্দমেলা' এ.বি.পি. লিমিটেড
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১
প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে এবং পুরস্কৃত হবেন।
পুরস্কার গ্রহণের ঠিকানা:
Monarch India Pvt. Ltd.
23, Brabourne Road
7th Floor, Calcutta 700 001

আর্চি
এ বইটা দারুণ। পড়তে শুরু করলে আর হাত থেকে নামানো যায় না।
আর্চি আসছে মনে হচ্ছে।
দুর, ওকে পাত্তা দিই না আমি।
এই যে, আর্চি তোমার বলটা বাবার পড়ার ঘরে ঢুকল।
জাগহেড, জলদি চলো।
মরেছে, টেবিল ল্যাম্পটা!
ধরে ফেলেছি!
ফুলদানিটা ধরো! আরে মূর্তিটা গেল বুঝি!
উনি দেখেছেন কি?
না বোধ হয়।
যাক, আবার সব ঠিকঠাক করে নিলাম।
বাঃ
বুঝলে হে, বলতেই হবে বইটা দারুণ ছিল
বটেই তো।

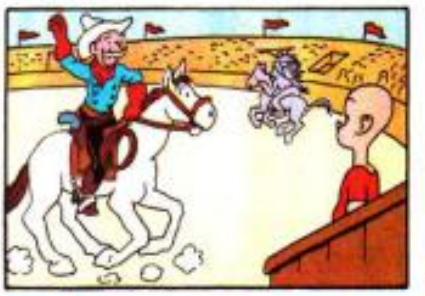

গাবলু
27
একটা নাল প্রাপ্তি নিলাম, কেমন?

খাদে এক খেলনাগাড়ি

সঞ্জীব সিংহ

কম্পিউটারের মনিটরে ভেসে উঠল একটা ছোট্ট খেলনাগাড়ি। অ্যানিমেশন বা কার্টুন ফিল্মে এরকম ছোট্ট গাড়ি দেখা যায়। চারটে চাকা ঘুরছে, পেছনে ফুসফুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে, দেখলে মজা লাগারই কথা।

শমির মনের কথাটাই যেন ডাঃ দত্তকে বললেন বিক্রমদা, "অন্যসময় হলে গাড়িটা দেখে মজা পেতে পারতেন আপনি।"

ডাঃ দত্ত মনিটর থেকে চোখ সরালেন না। বললেন, "ঠিকই বলেছেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি। অন্যসময় হলে গাড়িটা দেখে মন ভাল হয়ে

যেত। কিন্তু এখন...," থেমে এক গ্লাস জল খেলেন ডাঃ দত্ত। তারপর বললেন, "এই একটা ছোট্ট গাড়ি আমার জীবন দুর্বিষহ করে দিচ্ছে। রাতের ঘুম তো আগেই গিয়েছিল, অসীমের ঘটনাটা শোনার পর।"

একবার ডাঃ দত্তর দিকে, আরেকবার কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকাচ্ছিল শমি। খেলনাগাড়িটা কিছুদূর এগিয়ে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে খাদে! তারপর মনিটরে ভেসে উঠছে একটি লেখা। ইংরেজিতে। 'এবার তোমার পালা, তৈরি হও।'

সবে কয়েকদিন হল ই-মেলে এই রহস্যময় বার্তা পেতে শুরু করেছেন ডাঃ সুব্রত দত্ত। কয়েকদিন মানে এক সপ্তাহ। এর মধ্যেই বারচারেক তাঁর ই-মেলের ইনবক্সে বার্তাটি চলে এসেছে! উড়ো ফোন আসার মতো, অনেকে ই-মেলে উড়ো বার্তাও পেয়ে থাকে। সেদিক থেকে এই হুমকিকে অতটা গুরুত্ব না দিলেও হয়তো চলত। কিন্তু ডাঃ অসীম ঘোষের ঘটনাটা শোনার পর এই বার্তাকে আর হালকা করে দেখলে চলবে না।

মাসছয়েক আগের ঘটনা। ডাঃ অসীম দত্ত ই-মেলে ঠিক এরকম একটি বার্তা পেতে শুরু করেছিলেন। প্রথমদিকে যা হয়, একেবারেই গুরুত্ব দেননি। ভুলেও গিয়েছিলেন। তারপর মাসখানেক পরে আবার সেই বার্তা এল। যেন মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য! তারপর দিন পনেরো পরে। ধীরে ধীরে ব্যবধান কমতে লাগল। পনেরো থেকে কমে হল এক সপ্তাহ! একসময় প্রতিদিন আসতে শুরু করল সেই ভয়ঙ্কর খেলনাগাড়ি ! আর ঠিক তারপরেই একদিন সত্যিই গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ডাঃ অসীম ঘোষ। রাতে চেম্বার থেকে নিজেই মারুতি চালিয়ে ফিরছিলেন। একটা লরি তাঁর গাড়িকে পিষে দিয়ে চলে যায়।

মনিটরের নীচের দিকে শাট ডাউন লেখা শব্দটার ওপর গিয়ে মাউস ক্লিক করলেন ডাঃ দত্ত। মনিটরে ভেসে উঠল, ইট ইজ নাও সেফ টু টার্ন অফ....., কম্পিউটারের সুইচ টিপে বন্ধ করে দিয়ে ডাঃ দত্ত ঘুরলেন বিক্রমদার দিকে। বললেন, "তা হলে আপনিই বলুন ক্যাপ্টেন মুখার্জি, আমি কী করব? বাইরেবেরনোবন্ধ করে দেব? ঘরে বসে থাকব?" ডাঃ দত্তর গলায় একরাশ উদ্বেগ।

চেয়ারে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসলেন বিক্রমদা। যেন ভাবলেন কিছু! বললেন, "আপনার চেনাশোনা ডাক্তারদের মধ্যে আর কেউ এ-ধরনের ই-মেল পেয়েছে? আপনার জানা আছে?"

"নাঃ! অসীমই প্রথম।"

"স্ট্রেঞ্জ!"

"দেখুন অসীমের জায়গায় আমিও প্রথম হতে পারতাম। আমি ওই ই-মেলকে পাত্তা নাও দিতে পারতাম অসীমেরই মতো... অ্যান্ড, ও মাই গড!" দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন ডাঃ দত্ত। আর বোধ হয় শেষটা ভাবতে পারলেন না।

তা হলে একজন ডাক্তারেরও মৃত্যুভয় থাকে! শমি ভাবছিল গতকাল রাতের কথা। যখন ডাঃ দত্ত ফোন করেছিলেন বিক্রমদাকে। কাতর গলায় বলেছিলেন, "ক্যাপ্টেন মুখার্জি,আপনি আমাকে বাঁচান।"

সাধারণত একজন ডাক্তারের কাছে মানুষ এই আবেদন নিয়ে যায়। এখানে ব্যাপারটা একেবারেই উলটো হয়ে গেছে।

বিক্রমদা বলেছিলেন, "কী হতে পারত, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। কী হতে পারে সেটাই এখন ভাবা দরকার।"

মাথা নাড়তে নাড়তে ডাঃ দত্ত বললেন, "কী আর হবে? সব শেষ হয়ে যাবে। এতদিনের এত কষ্ট, তিলে তিলে গড়ে তোলা আমার নার্সিংহোম... সব শেষ হয়ে যাবে একটা উন্মাদ খুনির জন্য!"

অতবড় একটা মানুষকে ছোট্ট ছেলের মতো ব্যাকুল হতে দেখলে কেমন লাগে না? শমি অন্যদিকে মুখ ফেরাল। মনে হল একবার বলে, এই ই-মেল তো উড়ো ফোনের মতোও হতে পারে! আর ডাঃ অসীম ঘোষের মৃত্যু যে সত্যিই দুর্ঘটনা নয়, তাই বা কে বলতে পারে!

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে কথাটা যে বিক্রমদা একবারও বলেননি, এমন নয়। ডাঃ দত্ত শুনলে তো! ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটা ধরেই নিয়েছেন অসীম ঘোষের মতোই তাঁর মৃত্যুও হবে গাড়ি-দুর্ঘটনায়! নিজের নতুন কেনা এস্টিম গ্যারাজে তুলে রেখেছিলেন। দু'দিন মেট্রো আর বাসে চড়ে বুঝে গেছেন সম্ভব নয়! নিজের নার্সিং হোম ছাড়াও শহরের চারদিকে চারটে চেম্বার তাঁকে সামলাতে হয়! নিজের গাড়ি না থাকলে তো সত্যিই অসুবিধে।

বিক্রমদা উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে মুখ তুললেন ডাঃ দত্ত, "আপনি চলে যাচ্ছেন?"

"আপাতত এখানে তো কিছু করার নেই। একটু চোখ-কান খুলে রাখবেন। আর রাত্তিরটা বাড়ির বাইরে না থাকলেই ভাল।"

"কিন্তু কে এই ই-মেল পাঠাচ্ছে, তা কি কোনওভাবেই জানা যাবে না?"

"সেটাই তো জানার চেষ্টা করব। আপনি খুব ভাল করে ভেবে দেখুন, আপনার আর অসীমবাবুর কোনও কমন শত্রু ছিল কিনা? সময় নিয়ে ভাবুন। মনে পড়লেই আমাকে ফোন করবেন।"

"কমন শত্রু... না, না, তা কী করে হয়। জানত আমরা কখনও কারও ক্ষতি করিনি।"

"সেটা আমিও বিশ্বাস করি ডাঃ দত্ত। ডাক্তাররা যেদিন জেনেবুঝে মানুষের ক্ষতি করবে, সেদিন আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে সভ্যতার?"

মাথা নিচু করে, চুপচাপ বসে থাকলেন ডাঃ দত্ত।

॥ ২ ॥

"ডাঃ দত্তর কাছে প্রতিটি ই-মেল পাঠানো হয়েছে রাস্তার ইন্টারনেট বুথ থেকে।অসীম ঘোষ যেসব বার্তা পেয়েছিলেন, তাও এসেছিল এইভাবেই... বুথ থেকে! অবশ্য এটা যে ঘটবে, তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম।" কথা বলতে বলতে বিক্রমদা থামলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে রাকেশদা বললেন, "এই বুথগুলোয় গেলে অন্তত একটা খবর পাওয়া যাবে। যে পাঠাচ্ছে, সেই লোকটা কেমন দেখতে, তা তো জানা যেতে পারে।"

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন, "এগজ্যাক্টলি। সেটা আমি এখনই যাচ্ছি। গতরাতে লাস্ট যে মেসেজটা পেয়েছেন ডাঃ দত্ত তা এসেছে শেক্সপিয়র সরণির একটা ইন্টারনেট বুথ থেকে। বার্তা পাঠানো হয়েছে রাতের দিকে। দশটা পনেরো মিনিটে।"

"তা হলে তো ওই বুথে রাতের দিকে যার ডিউটি ছিল, সে বলতে পারবে!"

"পারা উচিত।"

"আমি কি যাব সঙ্গে?"

রাকেশদার প্রশ্নে মাথা নাড়লেন বিক্রমদা, "তোর পুলিশের পোশাক দেখলে লোকজন বড্ড ঘাবড়ে যায়। তবে একটা কাজ তোকেই করতে হবে! ওটা আমার দ্বারা হবে না।"

রাকেশদা হাসলেন। "সে হয়ে যাবে। তুই আগে জেনে আয় লোকটা কেমন দেখতে! সঙ্গে কেউ ছিল কি না! তারপর না হয় ওর জন্য ফাঁদ পাতা যাবে।"

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের প্রধান রাকেশ চৌধুরি বিক্রমদার ছেলেবেলার বন্ধু। কোনও কেসে আটকে গেলে রাকেশদা যেমন বিক্রমদার সাহায্য নেন, ঠিক সেরকমই বিক্রমদা ডাকলেও ছুটে আসেন।

সকালবেলায় ডাঃ সুব্রত দত্তর বাড়ি থেকে ফিরেই বিক্রমদা গিয়েছিলেন বিদেশ সঞ্চার নিগমের অফিসে। ওখান থেকেই ইন্টারনেটের কানেকশন দেওয়া হয়। শমির যতটুকু কম্পিউটার-জ্ঞান, তাতে ও বুঝেছে, বিদেশ সঞ্চার নিগমের ভূমিকা হল অনেকটা পোস্ট অফিসের মতো। একজন আরেকজনকে চিঠি লিখলে যেমন ডাকঘরের মাধ্যমে সেই চিঠি

পৌঁছয়, এটাও অনেকটা সেরকমই। 'ই-মেল' বা 'ইলেকট্রনিক মেল' আসে একজনের কম্পিউটার থেকে আরেকজনের কম্পিউটারে। পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আসুক না কেন সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড! খরচও এত কম, যা ভাবা যায় না! খুব স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠছে এই ই-মেল!

চিঠিতে যেরকম ডাকঘরের ছাপ দেখে বোঝা যায় কোথা থেকে আসছে, ঠিক সেরকমই ই-মেল এলেও বোঝা যায় তা কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে! প্রেরকের ই-মেল অ্যাড্রেস ফুটে ওঠে মনিটরে।

শমি জানে, আপাতত বিক্রমদার হাতে সূত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। ডাঃ দত্তকে যে লোকটা হুমকি দিচ্ছে, সে বার্তা পাঠানোর জন্য বেছে নিয়েছে রাস্তার ইন্টারনেট বুথ। স্থানীয় থানার মারফত যাতে প্রতিটি বুথকে সতর্ক করে দেওয়া যায়, সেজন্যই রাকেশদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিক্রমদা।

"জানি ব্যাপারটা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই।" বাইক চালাতে চালাতে বলছিলেন বিক্রমদা।

শমিরা এখন যাচ্ছে শেক্সপিয়র সরণিতে। যদি লোকটার চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায়! নইলে আরও দু-একটা বুথে হানা দিতে হবে।

সন্ধেবেলার এই সময়টায় কলকাতার রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়ার ভিড় আচমকা বেড়ে যায়। এখনও অবশ্য ঠিক সন্ধে হয়নি। পার্ক স্ট্রিটে চারমাথার মোড়ে জওহরলাল নেহরুর মূর্তির পেছনে ময়দানের গাছপালার আড়ালে সূর্য ডুবেছে কিছুক্ষণ হল। অতিকায় ডাইনোসরের মতো একটা মেঘ রং বদলাচ্ছে ঘন ঘন। চারমাথার জ্যামে আটকে আছে শমিরা। এই সময় কিছুক্ষণ আকাশ দেখা যায়।

বিক্রমদাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি। নিজে থেকেই বললেন, "খুনের হুমকি দেওয়ার জন্য যে লোক ই-মেল ব্যবহার করে, সে কখনও খুব সাধারণ চোর-ডাকাত হতে পারে না!"

শমি বলল, "তা ছাড়া চোর-ডাকাত হলে তো টাকাপয়সা দাবি করত।"

"সে তো বটেই।"

"কোনও পুরনো শত্রুতা?"

"এটা আমার মাথায় আসেনি, এমন নয়। কিন্তু মুশকিল হল, ডাঃ দত্ত বেশ জোর দিয়েই দাবি জানাচ্ছেন, পুরনো কোনও শত্রুতা নাকি নেই!"

"এমন নয় তো, লোকটার খুব কাছের মানুষের চিকিৎসার ত্রুটির জন্য দায়ী ছিল এই দুই ডাক্তার?"

সামনের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বিক্রমদা বাইকে স্টার্ট দিয়ে বললেন, "চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু হলে লোকজন বড়জোর ভাঙচুর করে। এসব রাগ পড়ে যাওয়ার জন্য দু-চারদিন যথেষ্ট। সেখানে ডাঃ অসীম ঘোষ ই-মেলে হুমকি পেতে শুরু করেছিলেন ছ'মাস আগে থাকতে! এতদিন ধরে রাগ পুষে রাখার জন্য কলজের জোর চাই রে...নইলে হয় না!"

শেক্সপিয়র সরণিতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরি ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগোলে পড়ে ফোন আর ইন্টারনেট বুথ। গলির ভেতর। অন্ধকার মতন হয়ে আছে। লোকটা খুঁজে খুঁজে ভাল জায়গাই বের করেছিল! শমি ভাবল।

বিক্রমদার পরিচয় পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুথের ছেলেটা। অল্পবয়সী ছেলে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স। ছেলেটা বলল, "সার, একটু ঠাণ্ডা বলি।"

বিক্রমদা বললেন, "পরে। তার আগে দেখুন তো ভাই, হেল্প করতে পারেন কিনা!"

"বলুন সার।"

"গতরাতে দশটা নাগাদ আপনার এখান থেকে একটি ই-মেল পাঠানো হয়েছিল। এই কলকাতার অ্যাড্রেসেই।"

"হ্যাঁ সার।" ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "খুব বৃষ্টি পড়ছিল। রেনকোট পরে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। আসলে ফোন করতেই বেশি লোক আসে। ই-মেলের কাস্টমার তো কম। তা ছাড়া—" ছেলেটা থেমে বিক্রমদার মুখের দিকে তাকাল।

বিক্রমদা বললেন, "হ্যাঁ বলুন।"

"সার, কোনও গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ব না তো?"

"আমাকে হেল্প করলে কোনও গণ্ডগোলে পড়বেন না। গ্যারান্টি।" বিক্রমদা হাসলেন। বললেন, "না করলেই বরং গণ্ডগোল। তখন আবার পুলিশ আসবে।"

ছেলেটা খপ করে বিক্রমদার হাত ধরে ফেলল, "না সার। আর পুলিশ ডেকাবেন না। এমনিতেই আমাদের লাইফ হেল করে দেয়।"

"বেশ তো। বলুন। কেমন দেখতে লোকটাকে? লম্বা, বেঁটে না মাঝারি? দাড়ি আছে। হেঁটে এসেছিল? না কি স্কুটারে? না কি বড় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল? যা জানেন, সব বলে ফেলুন। ভেবে নিন। কোনও তাড়া নেই।"

এত প্রশ্নে ছেলেটা সামান্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বলল, "সত্যি কথা বলতে কী সার, লোকটাকে খুব ভাল করে দেখিনি। আসলে লোকটা যে ট্যাক্সিতে এসেছিল তার ড্রাইভারের সঙ্গে আমার আবার চেনা বেরিয়ে গেল।"

"হোয়াট!" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন বিক্রমদা। শমি বুঝেছে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর মতোই খবর এটা!

"হ্যাঁ সার। চেনা মানে আমার পাড়াতেই ওর গ্যারাজ। ড্রাইভারের নাম লালু। খুব ভাল ছেলে সার। ওর বাবাও ট্যাক্সি চালাত। ওর দাদাও ট্যাক্সি চালাত, চাকরি পেয়ে গেল..." বিক্রমদা না থামালে ছেলেটা হয়তো আরও ইতিহাস বলে যেত।

বিক্রমদা বললেন, "আপনি ভাই এবার ইতিহাস ছেড়ে ভূগোলে ঢুকুন।"

"মানে?"

"মানে গ্যারাজটা কোথায়? ওই লালু কি রাতে গ্যারাজ করে গাড়ি। না কি সারারাত চালিয়ে সকালে আসে?"

"না সার। এই আমিও বুথ বন্ধ করে ফিরি, ও গাড়ি নিয়ে ফেরে। মাঝেমধ্যে দেখা হয়।

গ্যারাজের পাশে নাড়ুদার চায়ের দোকান আছে। খুব ভাল লোক! ওখানে হয়তো কখনও-সখনও বসি। সুখদুঃখের গল্প..." আবার বিক্রমদাকে থামাতে হল। বললেন "একটা ফোন করব ভাই আপনার এখান থেকে।"

"এস টি ডি? তা হলে সার ভেতরে।"

"না, লোকাল।"

শমি জানে বিক্রমদা ফোন করছেন রাকেশদাকে। লোকটার ডেসক্রিপশন দিয়ে সব বুথে খবর পাঠানোর চেয়েও এখন বেশি জরুরি হল লালুকে ধরে ফেলা। বেকবাগানে লালুর গ্যারাজ। সেখানে কি রাকেশদাও আসছেন?

"নাঃ, রাকেশ এসে কী করবে?" বিক্রমদা বাইকে স্টার্ট দিয়ে বললেন, "লোকাল থানা থেকে আপাতত পুলিশ পাঠিয়ে দিয়ে বললাম। কারণ, আমরা পৌঁছনোর আগেই যদি লালু গ্যারাজে গাড়ি রেখে চলে যায়, তা হলেই একদিন পিছিয়ে যেতে হবে।"

'লোকটা গতরাতে লালুর গাড়িতেই যে বাড়ি ফিরেছে, এমন তো নাও হতে পারে।' শমির অনেকক্ষণ ধরেই কথাটা মনে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত বলেই ফেলল। আসলে শমির কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, এত সহজে লোকটাকে ধরে ফেলা যাবে!

বিক্রমদা বললেন, "লালুর ট্যাক্সিতেই লোকটা বাড়ি ফিরবে, এতটা আশা আমি করছি না। তবে অনেক দরকারি ইনফরমেশন পাওয়া যাবে। ট্যাক্সি যারা চালায়, তাদের পর্যবেক্ষণশক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি হয়।"

"কেন?"

"ওদের স্নায়ুগুলো সবসময় অ্যালার্ট থাকে বলেই বোধ হয়। অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ খুব কমই পায় ওরা। অনেক দেখে। মনেও রাখে।"

বেকবাগানে লালুর গ্যারাজ, নাড়ুর চায়ের দোকান খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না। কিন্তু কোথায় পুলিশ? বিক্রমদা হেসে বললেন, "পৃথিবী জেটযুগে ঢুকে পড়লে কী হবে, কেউ কেউ এখনও গোরুর গাড়িই পছন্দ করে! কী আর করা যাবে।"

নাড়ুদার চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানা গেল লালু এখনও ট্যাক্সি রাখতে আসেনি। তবে আসবে।

চা বানাতে বানাতে নাড়ুদা জানালেন, "আমার হাতের চা না খেলে ওর রাতের ভাত হজম হবে না! আপনারা বসেন, ও ঠিকই আসবে।"

বিক্রমদা বললেন, "এরকম আত্মবিশ্বাস দেখলেও ভাল লাগে! দেখি আমাদের রাতের ভাত হজম হতে কোনও সাহায্য করে কিনা!"

চায়ের অর্ডার দিয়ে সবে বিক্রমদা বসেছেন, একটা হলুদ ট্যাক্সি এসে থামল।

চা ছাঁকতে ছাঁকতে নাড়ুদা জানালেন, "যাক, আপনাদের কপাল ভাল। লালু আজ তাড়াতাড়ি এসেছে!"

লালু ছেলেটা সত্যিই ভাল! চায়ে চুমুক দিতেই ওর সব মনে পড়ে গেল। বলল, "কাল রাত দশটা নাগাদ..., হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শেষ প্যাসেঞ্জার বলেই আরও বেশি মনে আছে। খুব বৃষ্টি পড়ছিল তো! শিয়ালদার একটা হোটেলের কাছে নামিয়েছিলাম। খুব লম্বা। রেনকোট পরে ছিলেন ভদ্রলোক।"

"হোটেলের নাম?"

"সোনালি।"

"অনেক ধন্যবাদ ভাই।" বিক্রমদা উঠে দাঁড়ালেন। "শমি কুইক।" প্রায় দৌড়ে গিয়ে বাইকে স্টার্ট দিলেন বিক্রমদা।

"রাকেশদা?" কোনওরকমে কথাটা বলতে পারল শমি। "রাকেশদাকে খবর দেওয়া হবে না?"

বিক্রমদা বললেন, "খুব একটা জরুরি নয়। আপাতত ওখানে পৌঁছনো দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।"

ঝড়ের বেগে বাইক চালাচ্ছেন বিক্রমদা। এখন রাতের দিকে রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে। বুকে এত জোরে ধুকপুক শব্দ হচ্ছে যে, শমি ভয় পেল, বিক্রমদা না শুনতে পান! লোকটাকে এত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা যাবে, ভাবতেও পারেনি শমি। লোকটা যখন শিয়ালদার হোটেলে উঠেছে, তখন এর একটাই মানে হয়। যে হুমকি দিচ্ছে ই-মেলে, সে কলকাতায় থাকে না। বাইরে কোথায় থাকে? দুই ডাক্তারের ওপর লোকটার এত রাগের কারণ কী?

শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নীচে হোটেল সোনালি। ওপর থেকে দেখা যায় স্টেশন চত্বর বেশ জমজমাট। বাড়ি ফেরার লোকের ভিড়। কিছুক্ষণ অলসভাবে মানুষ দেখতে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু উপায় নেই।

হোটেল সোনালির রিসেপশনে বসে ঝিমোচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়। বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যায়, এ-হোটেলের খরচ বেশি নয়। রং হয়নি বহুকাল। প্রাচীন দেওয়াল থেকে পলস্তরা খসে পড়ছে। জানলার পরদার আসল রং কী ছিল, তা জানার এখন আর কোনও উপায় নেই।

"খুব লম্বা কোনও বোর্ডার আছে আপনার হোটেলে? দু-একদিনের মধ্যে চেক-ইন করেছে!"

প্রৌঢ় মাথা নাড়লেন। বললেন, "কী নাম? এন্ট্রি খাতা দেখতে হবে।"

"মিঃ প্রদীপ বিশ্বাস।" বানিয়েই একটা নাম বললেন বিক্রমদা।

"নাঃ, ওই নামে কোনও লম্বা লোক তো দূরের কথা, মাঝারি বা বেঁটে লোকও কেউ নেই দাদা।"

প্রৌঢ়ের নাকের সামনে নিজের কার্ডটা নাচালেন বিক্রমদা। প্রৌঢ় চশমার ফাঁক দিয়ে একবার বিক্রমদার দিকে, একবার শমির দিকে দেখলেন। বললেন, "কী জানতে চান?"

"কাল রাতে এই সময় আপনি এখানে ছিলেন?"

"ছিলাম।"

"খুব লম্বা একজন লোক ট্যাক্সি থেকে নেমে এই হোটেলে ঢুকেছিল।"

"রুম নাম্বার থার্টিন। মিঃ অনন্ত ভার্গব। মুখে বসন্তের দাগ।"

"তিনি এখন ঘরে আছেন?"

"ভোরবেলায় চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন।"

আচমকা বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল শমির। ও এই ভয়টাই পাচ্ছিল। বিক্রমদাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, হতাশ হয়েছেন কিনা। উলটে হাসতে হাসতে শমিকে বললেন, "লোকটাকে পেয়ে গেলেই বরং হতাশ হয়ে যেতাম। যে লোক ই-মেলে হুমকি পাঠায়, তাকে এত সহজে কি আর ধরা যায় রে? তবু...," রিসেপশনের প্রৌঢ়ের দিকে তাকালেন বিক্রমদা। বললেন, "ওই ঘর কি এখন ফাঁকা আছে? না কি নতুন লোক এসেছে?"

"নাঃ, ফাঁকাই আছে।"

"ভেরি গুড। একবার ঘরটা দেখব।"

অত্যন্ত সাধারণ একটি ঘর। জানলা দিয়ে দেখা যায়, পাশের বাড়িতেই টিভি চলছে। খালি গায়ে লুঙ্গি পরে একটি লোক শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল। বিক্রমদাদের দেখে লোকটা উঠে এসে দড়াম করে জানলা বন্ধ করে দিল।

বিক্রম বললেন, "বাঃ।"

শমি জানে বিক্রমদা খুশি হয়েছেন অন্য কারণে। বিছানার চাদর থেকে শুরু করে কোনও কিছুই এখনও পালটানো হয়নি! ঘরের সবকটা আলো জ্বেলে দিয়ে বিক্রমদা কী যেন খুঁজতে শুরু করে দিলেন। কী খুঁজছেন বিক্রমদা, তা শমি জানে না। নিশ্চয়ই এমন কোনও সূত্র, যা থেকে ওই অদৃশ্য লোকটা সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাবে। কিন্তু জানা কি যাবে, কেন লোকটা ই-মেলে হুমকি দিচ্ছে? ওই খেলনা গাড়িটাই বা কেন ভেঙে পড়ছে খাদে? এর কি কোনও আলাদা মানে আছে?

॥ ৩ ॥

"অনন্ত ভার্গব যে দিল্লির লোক, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। একদৃষ্টিতে টেবিল ল্যাম্পের আলোর দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন বিক্রমদা।

কিছুক্ষণ আগে হোটেল সোনালি থেকে ফিরেছে শমিরা। হোটেলের ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে যেসব কাগজপত্র পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রয়েছে লন্ড্রির বিল, রাস্তার বুথ থেকে ফোনের বিল, কলকাতা আসার ট্রেনের টিকিট, ওষুধের দোকানের ক্যাশমেমো।

শমি অবাক গলায় বলল, "লোকটা নিজের নাম লুকনোর চেষ্টা করেনি কেন?"

বিক্রমদার কপালে বিখ্যাত তিনটে ভাঁজ। যেন কিছু ভাবছেন। বললেন, "সেটাই তো বড় খটকা। ইচ্ছে করলে নাম ভাঁড়ানোই যেত। আর লোকটাকে খুব অন্যমনস্ক বা অসতর্ক ভাবার কোনও কারণ নেই। অর্থাৎ নাম জানলেও ওর কিছু যায় আসে না? স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ!"

হোটেল সোনালি থেকে বেরিয়েই বিক্রমদা ফোন করেছিলেন দিল্লির সেই লন্ড্রিতে, যার বি পাওয়া গেছে হোটেলের ঘরে। রাতের দিকে দোকান তখন বন্ধ হওয়ার মুখে। বর্ণনা আর নাম শুনে ওরা সঙ্গে-সঙ্গেই চিনতে পারল ভার্গবকে। জানাল প্রায় বছরখানেক হল ভার্গব ওদের নিয়মিত কাস্টমার। না, ভার্গব কোথায় থাকে তা ওরা জানে না।

ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন বিক্রমদা। বললেন, "এখানেই ডাঃ দত্তর সাহায্য দরকার। অনন্ত ভার্গবের নাম শুনেও যদি ডাঃ দত্ত না চেনার ভান করে, তা হলে বুঝতে হবে ও কিছু লুকিয়ে যাচ্ছে।"

বিক্রমদা রিসিভারে হাত রেখেই কথা বলছিলেন। তুলতে যাবেন, ঠিক সেইসময় ফোনটা বাজল।

"হ্যালো। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন মুখার্জি বলছি। সে কী! ক'টায়?"

বিক্রমদার মুখ-চোখ, কথা বলার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু কোথায়?

ফোন রাখার পরেও কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকলেন বিক্রমদা। থমথম করছে চোখমুখ। তারপর যেন কিছুটা জোর করে টেনে তুললেন শরীরটাকে। শমিকে বললেন, "চল, বেরোতে হবে। ডাঃ দত্ত খুন হয়েছেন। নিজের বাড়ির লাগোয়া চেম্বারে।"

"কখন?"

"সম্ভবত সন্ধের পরেই। চেম্বার থেকে রোজ দেরি করে ফেরেন বলেই কেউ খোঁজখবর নেয়নি। কিছুক্ষণ আগে ডাকতে গিয়ে দেখে..." কথা শেষ না করে বিক্রমদা হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, "লোকটা যদি সত্যি কথা বলত, তা হলে হয়তো ওকে বাঁচানো গেলেও যেতে পারত।"

রাকেশদা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। ডাঃ

দত্তর বাড়ি পার্ক স্ট্রিটের পুলিশ কোয়ার্টার থেকে খুব দূরে নয়।

বিক্রমদাকে দেখে রাকেশদা এগিয়ে এলেন, "ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট। মাথায় একটা বাড়ি, শেষ। পুরো সার্জিকাল প্রিসিশন!"

ডাঃ দত্তর চেম্বারে ঢুকতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিক্রমদা।

রাকেশদা জিজ্ঞেস করলেন, "ফরেনসিকের লোকেরা এখনই আসবে। তার আগে কি তুই বডিটা দেখে নিবি?"

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন, "আমার দেখাটা খুব জরুরি নয়। কিন্তু তুই যেন একটু আগে কী বললি? সার্জিকাল..."

"প্রিসিশন। মানে.."

"শল্যবিদের দক্ষতায় খুনটা হয়েছে...এই তো!"

"এটা আমার ধারণা।"

"ইস, এটা আমার কেন যে আগে মাথায় আসেনি!"

"কোনটা?"

"পরে বলব। তার আগে রাকেশ, একটা উপকার করতে পারবি?"

"কী বল।"

"দিল্লি পুলিশে তোর বন্ধু কে আছে? খুব ঘনিষ্ঠ।"

"আকাশ মালহোত্রা। আমাদের ব্যাচের ছেলে। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার।"

"আকাশকে একটা ফোন কর। এখনই। একটা ছোট্ট জিনিস জানতে হবে। আকাশের আধঘন্টাও লাগবে না অবশ্য।"

"কী জানতে চাইছিস?"

"অনন্ত ভার্গব নামে কোনও ডাক্তার দিল্লির মেডিকেল রেজিষ্ট্রারে আছেন কিনা? অথবা ছিলেন কিনা।"

"আকাশ দিল্লিতে থাকলে জেনে যাবি। নইলে...।"

"লেট্‌স হোপ।"

আধঘন্টাও লাগল না। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ফোন করলেন মিনিট পনেরো পরেই। অনন্ত ভার্গব নামে এক ডাক্তার সত্যিই ছিলেন। কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন ছত্রিশ বছর আগে! কীভাবে মারা যান? ডেপুটি কমিশনার জানালেন, সেটা জানতে একটু সময় লাগবে। ছত্রিশ বছর আগের ঘটনা। "আজ রাতেই কি দরকার?" রাকেশদা জিজ্ঞেস করলেন বিক্রমদাকে, রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে।

বিক্রমদা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন, "নাঃ। আকাশকে ধন্যবাদ জানাস আমার তরফে। বাকিটা আমি দিল্লি গিয়েই জেনে নেব। তুই আমাকে শুধু আকাশের কন্ট্যাক্ট নম্বরটা দিস।"

॥ ৪ ॥

দিল্লির ওয়েস্টার্ন কোর্টে দু' পুরুষের বাসিন্দা অধ্যাপক খুশবন্ত শর্মা। বয়স প্রায় নব্বইয়ের কোঠায় হলেও তিনি এখনও সজাগ। প্রখর স্মৃতিশক্তি। এখনও রোজ সকালে একঘন্টা হাঁটেন। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটে তাঁর হাতে যত ছাত্র তৈরি হয়েছে, তারা দেশে-বিদেশে কোথায় কী করছে তাও তাঁর নখদর্পণে।

আকাশের কাছেই বৃদ্ধর সন্ধান পেয়েছেন বিক্রমদা।

অনন্ত ভার্গবের নাম শুনে বিষণ্ণ হয়ে উঠল বৃদ্ধর মুখ। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এত বছর পরে কেন তাঁর প্রিয় ছাত্রর খোঁজ করা হচ্ছে?

তদন্তর প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে পরিচয় গোপন করতে হয় বিক্রমদাকে। এখানে বিক্রমদা সেজে এসেছেন সাংবাদিক। ফ্রিলান্সার। বিক্রমদা বললেন, "একটা লেখার প্রয়োজনেই আমি জানতে চাই অনন্ত ভার্গব সম্পর্কে।"

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ যেন ভাবলেন অধ্যাপক শর্মা। বললেন, "সবার কথা তো ভাই মনে থাকে না। অনন্ত ছিল ওয়ান অব দ্য বেস্ট। ও আজ বেঁচে থাকলে মানবজাতির অনেক উপকারে আসতে পারত। মেডিকেল সায়েন্সে এরকম মাথাই তো দরকার। শুধু মাথা নয়, হৃদয়টাও চাই। তাও ছিল অনন্তর। বাট হি ওয়াজ ট্র্যাপড! বেচারা ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল।"

"কার ফাঁদে সার?"

"আমারই দুটি ছাত্র ছিল। নাম..., ভুলে গেছি। আসলে আঙুলের মাপ যেমন সমান হয় না, এও তেমনই।"

"নাম দুটো কি আমি বলব সার?" অনুমতি নিয়ে বিক্রমদা বললেন, "অসীম ঘোষ আর সুব্রত দত্ত।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। 'হতে পারে। একটা সেরিব্রাল হয়ে যাওয়ার পর থেকে এখন আর সব কথা মনে রাখতে পারি না। এনিওয়ে, ইট্‌স এ ট্র্যাজেডি। ওই দুটি ছেলে অনন্তকে মাতিয়েছিল নার্সিংহোম করার ব্যাপারে। খুবই অর্থবান ছিল অনন্ত। এক ছেলে। ওরা করেওছিল নার্সিং হোম— পাহাড়গঞ্জের কাছে।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন হঠাৎ শুনলাম অনন্ত নেই। ওরা তিনজন নাকি স্কি করতে গিয়েছিল মানালিতে। দু'জন ফিরে আসে। অনন্ত ওয়াজ সাপোজড টু বি কিল্‌ড ইন এ কার অ্যাক্সিডেন্ট। আই রিপিট, সাপোজড টু বি...।"

"বডি পাওয়া যায়নি?"

"নাঃ। সবচেয়ে বড় কথা কী জানো, অনন্তর মৃত্যুর চেয়েও বড় ট্র্যাজেডি হল, ওর স্বপ্নের মৃত্যু ঘটেছিল। নার্সিং হোমের সঙ্গেই পলিক্লিনিক চালাত অনন্ত। বহু গরিব, দুঃখী সেখানে চিকিৎসা পেত। অনন্ত বলত, সার, আমি বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরিবদের সেবা করব। সেই আদর্শকে যদি ওর দুই বন্ধু ধরে রাখত তা হলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ওরা তো করেনি।"

সামান্য উত্তেজিত দেখাল অধ্যাপক শর্মাকে। বললেন, "ওরা নার্সিং হোম বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। মোটা টাকা পেয়েছিল সন্দেহ নেই। শুধু এই কারণেই আমরা অনন্তর মৃত্যুকে মেনে নিতে পারিনি।"

"অনেক ধন্যবাদ সার।" উঠে আসার আগে বিক্রমদা বললেন, "আরেকটা প্রশ্ন। ধরুন আপনি যদি অনন্তর জায়গায় থাকতেন; কোনওভাবে সেই গাড়ি দুর্ঘটনায় বেঁচে উঠতেন, তা হলে কী করতেন?"

"দুই বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতাম।"

"কীভাবে?"

"আইন আছে, আদালত আছে। যদিও সেটা সময়সাপেক্ষ, তবু লড়তাম!"

"আপনার সময় যদি একেবারেই কমে আসত?"

হাসলেন অধ্যাপক শর্মা, "এই প্রশ্ন উঠছে কেন?"

"কারণ, অনন্ত ভার্গব এখনও বেঁচে আছেন।"

"হোয়াট?" চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

গোটা ঘটনাটা গোড়া থেকে এবার বললেন বিক্রমদা। ক্ষমা চাইলেন শুরুতে নিজের পরিচয় গোপন করার জন্য।

সব শুনে মাথা নাড়তে লাগলেন অধ্যাপক শর্মা। বললেন, "না, না, না, এটা ঠিক করেনি অনন্ত। আইন নিজের হাতে নিয়ে ও মোটেই ঠিক করেনি। কেন, আমরা কি মরে গেছি? আমরা ওর হয়ে সাক্ষী দিতাম। ওরা ঠিকই শাস্তি পেত। অনন্ত যা করল, তাতে তো এবার ও নিজেই শাস্তি পাবে। তুমি যখন এতটা এগিয়েছ, তখন নিশ্চয়ই অনন্তর সন্ধান পাবে একদিন।

বোধ হয় পাব না।" হাসলেন বিক্রমদা। বললেন, "অনন্ত ভার্গব এবার সত্যিই সব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন। ওঁর হাতে সময় সত্যি কমে এসেছে।"

পকেট থেকে একটি ওষুধের দোকানের ক্যাশমেমো বের করলেন বিক্রমদা। শিয়ালদার হোটেল সোনালিতে পেয়েছিলেন। অনন্ত ভার্গবের ঘরে।

ক্যাশমেমোটি হাতে নিয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল অধ্যাপক শর্মার। ধীরে-ধীরে বললেন, "এই ওষুধ এখন খাচ্ছে অনন্ত? এ তো ক্যান্সারের শেষ স্টেজে পৌঁছলে দেওয়া হয়। ব্যথা কমানোর জন্য। অবশ্য..." কথা শেষ না করে উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালেন অধ্যাপক খুশবন্ত শর্মা। কিছুক্ষণ পর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "যে ব্যথা অনন্ত প্রথম জীবনে পেয়েছে, তা তো এর চেয়েও অনেক বেশি। তাই নয় কি?"

চুপ করে বসে আছেন বিক্রমদা। শমি জানে এর উত্তর বিক্রমদারও জানা নেই।

ছবি : অনুপ রায়

Reading Seen : এবারের

জেরোম কে. জেরোম-এর 'এ ডেলি ড্রামা' নিশ্চয়ই তোমাদের সবচেয়ে পছন্দের লেসনগুলোর একটা। এবার আমাদের আলোচনায় থাকছে 'এ ডেলি ড্রামা' ছাড়াও 'দ্য ইম্পর্ট্যান্স অব জুট' এবং 'দ্য লস্ট চাইল্ড'। লিখেছেন

রণধীর ভট্টাচার্য

আলোচনা তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে

ই ং রে জি

গত কয়েকটি সংখ্যায় আমরা Reading Seen-এর বিভিন্ন Lesson নিয়ে আলোচনা করেছি। তার মধ্যে ছিল অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্য সেলফিশ জায়ান্ট'-এর মতো গল্পও। এ-সংখ্যাতেও চমৎকার একটা গল্প থাকছে আমাদের আলোচনায়। জেরোম কে. জেরোমের 'এ ডেলি ড্রামা'। ওঁর সৃষ্ট চরিত্র আঙ্কল পজার তো ইংরেজি রম্যসাহিত্যের এক অসামান্য সৃষ্টি। তবে 'এ ডেলি ড্রামা'-র আগে আমরা 'দ্য ইম্পর্ট্যান্স অব জুট' প্রবন্ধটির সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

THE IMPORTANCE OF JUTE

1. Read the following passage and answer the questions given below:

``Jute is almost entirely an Indian crop but it is cultivated on a large scale in Bangladesh, Pakistan ..... provided that the soil is deep enough rainfall is well distributed and temperature is favourable."

(a) **Answer in brief :**

(i) Which countries produce jute?

(ii) What things are made from jute?

(iii) Why is it called eco-friendly?

(iv) How jute-stalks are used in rural areas?

Ans. (i) India, Bangladesh, Pakistan, Brazil, Mexico, Japan, China, U.A.R, Argentina, Indonesia and Iran produce jute.

(ii) Various types of bags, wool, ropes, carpets, cloth and curtains are made from jute.

(iii) It is called eco-friendly, because things made from jute have a wide-market in the world and it is cheap in price.

(iv) People in the rural areas use jute-stalks as material for walling and as fuel.

(b) **Find out the True and False statements :**

(i) Things made from jute are not cheap and eco-friendly.

(ii) The superior and glossy fibres of jute are used for making carpets.

(iii) Jute is a seasonal crop.

(iv) People of rural areas don't use jute-stalks for walling or fencing.

Ans. (i) F (ii) T (iii) T (iv) F.

(c) **Give the synonyms of the following words from the text:**

(i) Appointed

(ii) Village

(iii) Produced

(iv) Shiny

Ans. (i) engaged (ii) rural areas (iii) cultivated (iv) glossy.

2. ``Being a rainy season crop, jute thrives well in moist heat. It can be grown in ..... sowing during the preparation of the land."

(a) **Study the following statements and find out the True and False statements:**

(i) Jute seeds require clean and clod free seed-bed

(ii) Jute is a Winter-season crop.

(iii) All weeds should be removed preferably by raking.

(iv) Additional manuring is not required in soils receiving fresh silt every year.

Ans. (i) T (ii) F (iii) T (iv) T.

(b) **Fill in the blanks with suitable words from** the text.

(i) The land for producing jute needs ploughed and —— several times.

(ii) After each —— the clods are broken up with a beam or a ladder

(iii) For getting good crops —— is generally used before sowing seeds.

(iv) In India rainfall is not ——

Ans. (i) cross ploughed

(ii) operation.

(iii) manure

(iv) well-distributed.

(c) **Give the synonyms of the following words:**

(i) lump

(ii) fine sediment of soil.
(iii) fertilizer.
(iv) to develop well.
Ans. (i) clod
(ii) silt
(iii) manure
(iv) thrive
3. ``The crop is generally harvested within three or four months after planting ..... finally strands are opened out, hung up in the sun to dry and tied into bales and made ready for the market.
(a) **Answer the following questions briefly:**
(i) When the crop is generally harvested?
(ii) What is called retting?
(iii) How is the jute fibre processed?
(b) Find out the synonyms of the following words from the text:
(i) to remove
(ii) soaked
(iii) heaped up
(iv) inundated
(c) **Describe in your own words how jute is processed by the farmer.**

THE LOST CHILD

(1) **Read the following passage and answer the Questions given below:**
``It was spring time. From the shadow of narrow lanes ..... they had walked so far and entered a footpath in a field."
(a) **Give the synonyms of the words:**
(i) Falling back
(ii) clothed
(iii) delaying
(iv) look
Ans.
(i) Receding
(ii) clad
(iii) lingering
(iv) stare
(b) **Answer the questions briefly.**
(i) Why did the boy lag behind his parents?
(ii) Why did the boy's father look at him angrily?

আগেও বলেছি, আবারও বলছি, Reading Seen বিভাগে ভাল নম্বর পাওয়ার এক এবং একমাত্র উপায় হল text'গুলো ভালভাবে পড়া।

(iii) Where from did emerge a gaily-clad crowd?
(iv) Where were the people going?
Ans. (i) The boy lagged behind as he was attracted by the toys in the shops.
(ii) The boy's father looked angrily when the boy wanted a toy.
(iii) A gaily-clad crowd emerged from the shadow of narrow lanes and alleys.
(iv) The people were going to the fair.
(c) **Write whether the following statements are true or false.**
(i) It was autumn time.
(ii)The little boy was very happy and filled with life and laughter.
(iii) His father looked at him calmly.
(iv) They had left a pitched road on which they had walked so far:
Ans. (i) False (ii) True (iii) False (iv) False.
(2) ``A man stood holding a pole..... He looked behind. There was no sign of them."
(a) **Answer the questions briefly.**
(i) What was a juggler doing?
(ii) What did a man hold in a pole?
(iii) Why did men and women cry with laughter?
(iv) What a bold request did the boy make to his father and mother?
Ans. (i) A juggler was playing a flute to a snake which coiled itself in a basket.
(ii) A man was holding yellow, red, green and purple balloons in a pole.
(iii) Men, women and childern carried in whirling motion in a round about shricked and cried with laughter.
(vi) The boy made a bold request to his father and mother, ``I want to go on the round about please."
(b) **Find out the True and Flse statements.**
(i) A man was selling all white balloons in the fair.
(ii) The child was afraid of the juggler.
(iii) The boy wanted to go on the round about.
(iv) The Child was lost when he was looking at the round about.
Ans. i) False (ii) False (iii) True (iv) True
(3) ``A man in the moving crowd.....I want my mother, I want my father".
(a) **Answer the following questions briefly**
(i) Who rescued the boy from the crowd?
(ii) What questions did the man ask the boy?
(iii) How did the man try to console the boy?
(b) **Find out the synonyms of the following words.**
(i) To make calm.
(ii) To bend the body forward.
(iii) To draw away.
(iv) To weep.
(c) **Write in 5 sentences, your feelings in case you are lost in a fair and then rescued by a gentleman.**

A DAILY DRAMA

(1) Read the following paragraph and answer the questions given below:
``From my uncle podger's house to the railway station was eight miles' walk.....They did not run well, they did not even tun

fast; but they tried their hardest."

(a) **Give the synonyms of the following words:**

(i) One-fourth part.

(ii) Rainy.

(iii) Slowly.

(iv) Cry out.

Ans. (i) Quarter

(ii) Wet

(iii) Gently

(iv) Shout

(b) **Answer the question briefly.**

(i) When did uncle podger start for the station?

(ii) What was his advice to others?

(iii) What did the fat gentleman carry with them?

Ans. (i) Uncle podger started five minutes before the time.

(ii) His advice to others was ``give yourself quarter of an hour and walk gently."

(iii) The fat gentleman carried a black bag and a newspaper in one hand and an umbrella in the other.

(c) **Write the True and False statements.**

(i) Uncle Podger's house was not at a great distance from the station.

(ii) Many thin gentlemen lived at eating.

(iii) Uncle Podger and other gentleman ran to station.

Ans. (i) True

(ii) False

(iii) True

(2) ``My uncle always got up early enough..... I don't want a paper in the garden; I want the paper in the train with me."

(a) **Answer the questions briefly.**

(i) What troubles came to uncle Podger in the last moment?

(ii) Whom did the blame for the missing things?

(iii) What did Aunt say to uncle Podger?

(b) **Say, whether the following statements are True or False.**

(i) Uncle Podger used to get up late.

(ii) Uncle Podger did not blame anybody for the missing thing.

(iii) Uncle Podger did not leave the paper in the garden.

(iv) Uncle Podger must be a great trouble to everybody round him.

(c) **Give the synonyms of the words given below.**

(i) Accused

(ii) To assign a probable cause.

(iii) Just before the start of an activity.

(iv) Food taken in the morning.

(লেখক হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক)

ভূ গো ল

ম্যাপ-পয়েন্টিং অবশ্যই শিখে রাখা দরকার

ভূগোল বিষয়টি জানতে হলে ম্যাপ-পয়েন্টিং শিখে রাখাটা খুবই জরুরি। ম্যাপটা ঠিকমতো জানলে ভূগোল শেখা অনেক সহজ হয়ে যায়। নিয়ম করে ম্যাপ-পয়েন্টিং অনুশীলন করা দরকার। লিখেছেন **কালিদাস চন্দ**

মানচিত্রে অবস্থান নির্ণয় অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বিভিন্ন অঞ্চল, শহর-বন্দর, খনিজ-শিল্পকেন্দ্র ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস রেখা মানচিত্রে সঠিকভাবে চিহ্নিত করাটাই হল ম্যাপ-পয়েন্টিং। জায়গাগুলির সঠিক অবস্থান জানতে পারলে ভূগোল শেখা অনেক সহজ হয়। তাই বলি, ম্যাপ-পয়েন্টিংটা ভাল করে শেখা দরকার। কিন্তু শিখবে কীভাবে? এ-সম্পর্কে তো আগের সংখ্যায় অনেক আলোচনা হয়েছে। পারলে আর একবার তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ো। আসলে, কথা কী জানো? শুধু দেখে রাখা বা জেনে রাখলেই চলে না, বিষয়টি ভাল করে আয়ত্তে আনা চাই। আর এর জন্যই দরকার অনুশীলন। ভারতের রেখা মানচিত্রে রোজ একটি করে ম্যাপ যদি অভ্যেস করো তা হলে কয়েকদিন পরে দেখবে ম্যাপ-পয়েন্টিংটা তোমার বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। মনে তখন অনেক জোর পাবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর এই অনুশীলনের জন্য খুব বেশি সময়ও লাগে না। পাঁচ-সাত মিনিটই যথেষ্ট সময়। এই সময়টুকু নিশ্চয়ই ব্যয় করতে পারবে।

আগের সংখ্যায় দুটি মানচিত্রের প্রথমটি ছিল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক

অঞ্চল বিষয়ে আর দ্বিতীয়টিতে ছিল পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ-উপসাগর বিষয়ে পয়েন্টিং। এবার আমরা আরও দুটি মানচিত্রে অন্যান্য জরুরি বিষয়গুলির ওপর প্রয়োজনীয় কিছু পয়েন্টিং দেখে রাখব। কৃষিজ ফসল উৎপাদক অঞ্চল ও নগর-বন্দরের ওপর পয়েন্টিং তো প্রতিবছরই আসে। কাজেই এগুলি একটু দেখে রাখা যেতে পারে। ধরা যাক, প্রশ্ন এল,

ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করো :

ক) একটি ইক্ষু/গম উৎপাদক অঞ্চল ও একটি চা উৎপাদক অঞ্চল, খ) একটি তুলা উৎপাদক অঞ্চল ও একটি তৈলবীজ উৎপাদক অঞ্চল, গ) একটি ধান/পাট উৎপাদক অঞ্চল ও একটি মিলেট উৎপাদক অঞ্চল, ঘ) একটি কফি উৎপাদক অঞ্চল ও দিল্লি, ঙ) শ্রীনগর ও চণ্ডীগড়, চ) ইলাহাবাদ ও আমেদাবাদ, ছ) বাঙ্গালোর ও কলকাতা, জ) হলদিয়া ও পারদীপ, ঝ) বিশাখাপত্তনম ও চেন্নাই, ঞ) কোচি ও মার্মাগাঁও, ট) মুম্বই ও কান্দলা, ঠ) পোর্টব্লেয়ার ও নাগপুর।

চিন্তায় পড়ে গেলে না কি? প্রদত্ত জায়গাগুলি কীভাবে ভারতের রেখা মানচিত্রে দেখাবে? ভাববার কিছু নেই। প্রথমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদক অঞ্চল প্রসঙ্গে বলা যায়, এক-একটি ফসলের ক্ষেত্রে তাদের প্রধান উৎপাদক অঞ্চলটি দেখানো দরকার। ধরো, তুলা বা কার্পাস ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এমনকী দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানও এর উৎপাদক অঞ্চল। কিন্তু পয়েন্টিং করার সময় মনে রাখতে হবে, আমরা

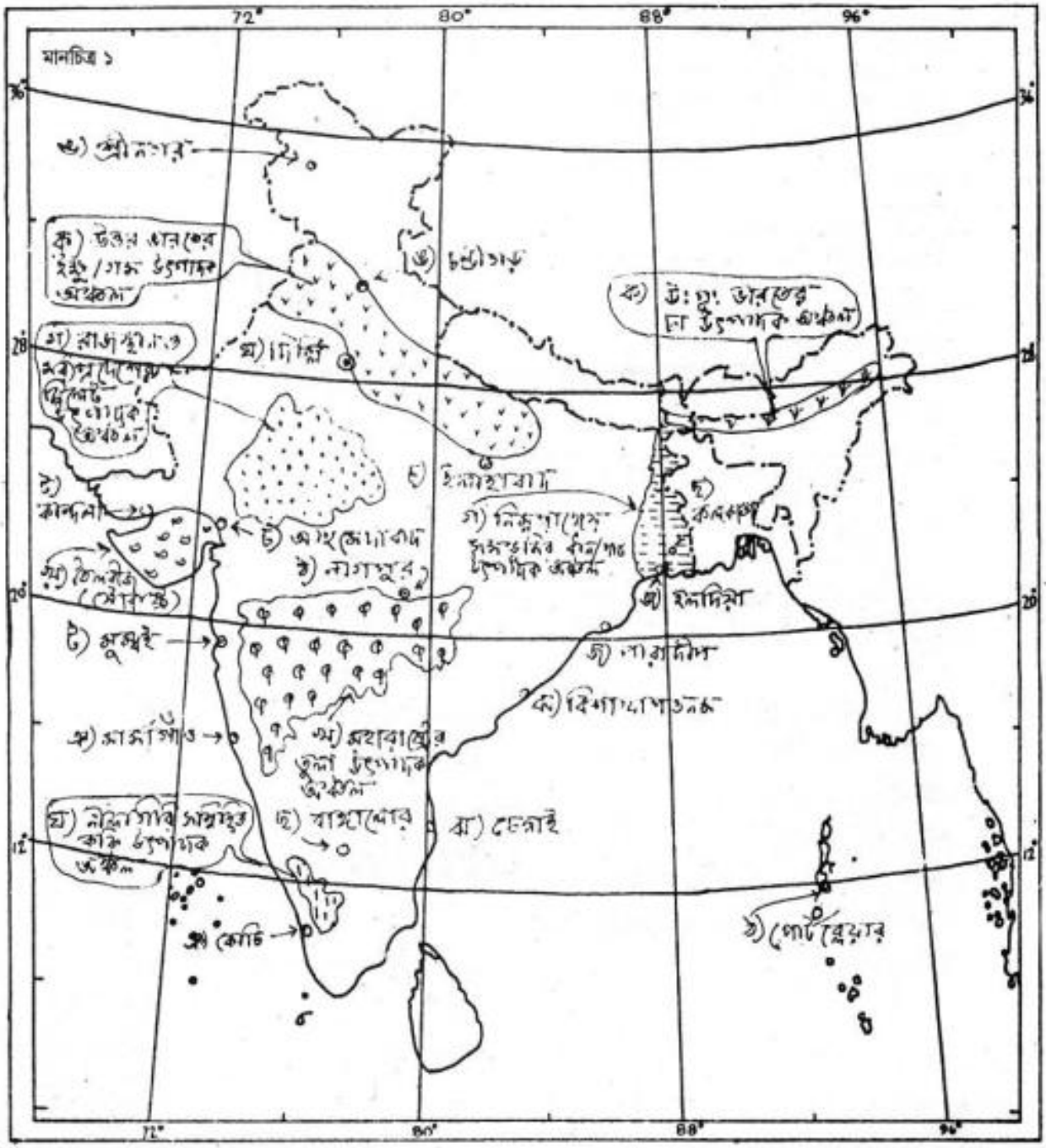

তুলার প্রধান উৎপাদক অঞ্চলটি চিহ্নিত করব। তোমরা তো জানো, তুলার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল হল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল। আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে,মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলটি হল তুলার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। কাজেই মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলকেই তুলার উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার। আবার ধরো, ইক্ষু উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। তবে উত্তর-ভারতেই বেশি পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয় বলে আমরা ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে উত্তর ভারতকেই চিহ্নিত করব। এবার বলি, সর্ষে, তিসি, তিল, রেড়ি, চিনেবাদাম প্রভৃতি—এগুলি তো তৈলবীজ। এগুলি থেকে তেল উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে চিনেবাদাম উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম। আর, এই ফসল উৎপাদনে গুজরাতের স্থান ভারতের মধ্যে প্রথম। আরও উল্লেখ্য, সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপ গুজরাতের প্রধান চিনেবাদাম উৎপাদক অঞ্চল। কাজেই তৈলবীজ উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে সৌরাষ্ট্রের অবস্থান দেখানো যেতে পারে। আর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলটি চিহ্নিত করাও তো খুব সহজ। একইভাবে চায়ের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চলটি চিহ্নিত করা যায় এবং প্রধান ধান বা পাট উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির অবস্থান দেখানো যায়। কি, বোঝা গেল তো? এবার সীমারেখা টেনে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন দিয়ে অঞ্চলটি দেখানো প্রয়োজন এবং অঞ্চলটির নাম ও প্রশ্নের নম্বর ক, খ, গ ইত্যাদি অবশ্যই লেখা দরকার।

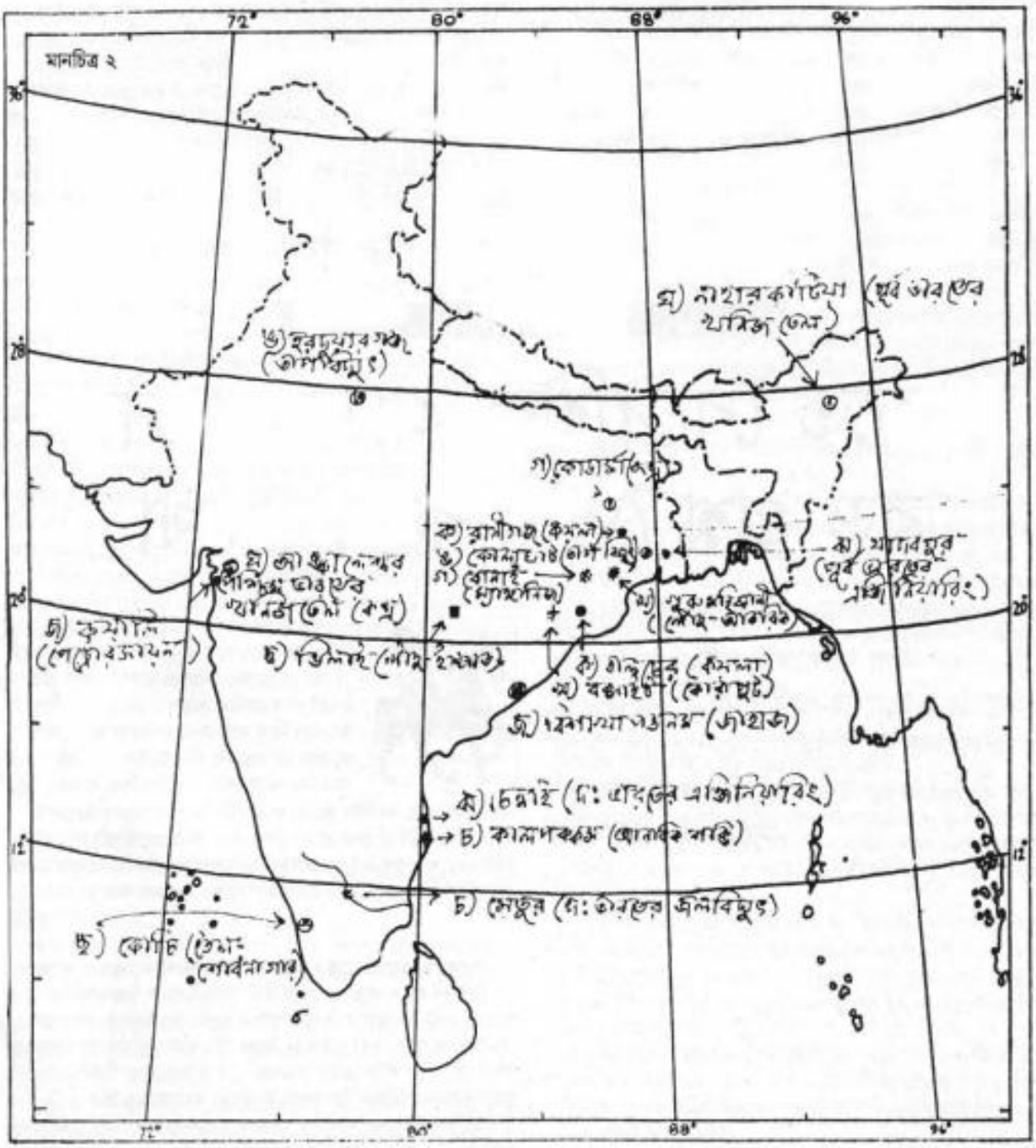

নগর ও বন্দর প্রসঙ্গে বলা যায়, ফুটকি চিহ্ন বা ছোট করে গোল চিহ্ন দিয়ে নগর ও বন্দরের অবস্থান দেখানো যায়। এবার ভাল করে মানচিত্রের প্রশ্নের সমাধানটি দেখে রাখো। (মানচিত্র ১ দ্রষ্টব্য)

এখন খনিজ, বিদ্যুৎ ও শিল্প এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্টিং দেখে রাখা যেতে পারে। ধরা যাক প্রশ্ন এসেছে,

ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করো।

ক) রানিগঞ্জ কয়লাখনি ও তালচের কয়লাখনি, খ) একটি লৌহ-আকরিক উৎপাদন কেন্দ্র ও একটি বক্সাইট খনি, গ) একটি অভ্রখনি ও একটি ম্যাঙ্গানিজ খনি, ঘ) পূর্ব ভারতের একটি খনিজ তেল কেন্দ্র ও পশ্চিম ভারতের একটি খনিজ তেল খনি, ঙ) উত্তর ভারতের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, চ) দক্ষিণ ভারতের একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও একটি আণবিক শক্তিকেন্দ্র, ছ) একটি লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র ও একটি তৈল শোধনাগার, জ) একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ও একটি পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র, ঝ) পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের একটি করে এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্র।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, যদি নির্দিষ্ট কোনও নামের উল্লেখ না করে একটি শিল্পকেন্দ্র, খনিজকেন্দ্র, বিদ্যুৎকেন্দ্র বা তৈলখনি ইত্যাদি পয়েন্টিং করতে দেয়, তা হলে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটির অবস্থান দেখানোই ভাল। এমন বিখ্যাত কেন্দ্রের উল্লেখ করতে হবে, যা সহজেই চেনা যায়। আলাদা-আলাদা সঙ্কেত চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রের নাম-সহ অবস্থান দেখানো দরকার। আর-একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবে, ম্যাপ-পয়েন্টিং-এর কাজটি খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে করা দরকার। ম্যাপের ভেতর লেখার কাজও সুন্দর হস্তাক্ষরে হওয়া প্রয়োজন। একটু ধরে-ধরে পরিষ্কার করে লিখবে। দ্বিতীয় মানচিত্রের প্রশ্নের সমাধানটিও ভাল করে দেখে রাখো। (মানচিত্র ২ দ্রষ্টব্য)

গত সংখ্যায় দুটি আর এবারকার সংখ্যায় দুটি, মোট চারটি মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু পয়েন্টিং দেখে নেওয়া গেল। এগুলি ভাল করে অভ্যেস করবে। এর পর মাধ্যমিকের বিভিন্ন বছরে আসা মানচিত্রের প্রশ্নগুলির সমাধান করে ফেলবে। আর, নিয়ম করে টেস্টপেপারের মানচিত্রের প্রশ্নগুলির সমাধান অভ্যেস করবে। মনে রাখবে, অনুশীলনের কোনও বিকল্প নেই। ম্যাপটা ঠিকমতো করতে পারলে পরীক্ষায় দশে দশ নম্বরই পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, বিভিন্ন স্থানের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে। ভূগোল শিখতে ও বুঝতে ম্যাপ-পয়েন্টিং খুবই কাজে আসে। তাই বলি, ম্যাপ-পয়েন্টিংটা ভাল করে শিখে রাখা দরকার।

(লেখক 'দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন'-এর ভূগোলের শিক্ষক)

ইতিহাস

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি করে রাখো

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ বিষয়ে বড় প্রশ্ন আসতেই পারে। সেক্ষেত্রে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ও তার ফলাফল কী হয়েছিল, সে বিষয়ে উত্তর তৈরি করে রাখা জরুরি। জানিয়েছেন

সুদেব মুখোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় আমরা টীকা কীভাবে লেখা উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই পর্বে আমরা তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা চিন্তা করেই নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচি থেকে বৈদেশিক আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করব। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল কী হয়েছিল এবং এই আক্রমণ কেমনভাবে ভারতের শিল্প, ও ধর্মকে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে আমরা রচনাধর্মী উত্তর আলোচনা করব। এ ছাড়াও কোন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়, এই আন্দোলন প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পেরেছিল কিনা, তা নিয়েও রচনাধর্মী উত্তর আলোচনা করা যাবে।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল আলোচনা করো।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ বৈদিক যুগের উপান্তে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছোট-বড় রাজ্যগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ায় এক চরম রাজনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে যে সমস্ত বৈদেশিক শক্তি ভারত আক্রমণ করে তাদের মধ্যে গ্রিকবীর আলেকজান্ডার ছিলেন নিঃসন্দেহে অন্যতম। সমসাময়িক গ্রিক ঐতিহাসিকদের রচনা, পারসিক বহিস্থান, নাক্স-ই-রুস্তম লিপি থেকে এই অভিযান সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য জানা যায়।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফলকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক মহলে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। আলোচনার সুবিধার্থে আলোচ্য এই অভিযানের ফলাফল নিম্নোক্ত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল।

প্রত্যক্ষ ফল : এই আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মানুষকে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। পরাজয় ও আত্মসমর্পণের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অসংখ্য মানুষ জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, সিন্ধুদেশেই নানাভাবে মৃতের সংখ্যা ছিল ৮০,০০০-এর বেশি। এমনকী নারীরাও তাঁদের সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য শিশুদের নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওই নারীদের আগুনে আত্মাহুতির দৃষ্টান্তকে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের ইতিহাসে প্রথম 'জওহর ব্রত' পালনের দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন।

উপনিবেশ স্থাপন : আলেকজান্ডারের আক্রমণের অন্যতম স্থায়ী ফলস্বরূপ উত্তরাপথে বুকিফালা, নিকিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, যোগভিয়া নামক বিভিন্ন গ্রিক বা যবন উপনিবেশ গড়ে ওঠে। মৌর্য যুগেও এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। উল্লেখিত উপনিবেশগুলি গ্রিক সংস্কৃতি-বিকিরণের পাশাপাশি গ্রিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্রেও পরিণত হয়।

যোগাযোগের উন্নতি : তাঁর আক্রমণের ফলে সমকালীন মানুষের ভৌগোলিক দিগন্তও লক্ষণীয়ভাবে প্রসারিত হয়। কাবুল, বেলুচিস্তানের মুল্লা গিরিপথ, মাকরানের মধ্য দিয়ে তিনটি স্থলপথ এবং পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হয়। ফলস্বরূপ দুই মহাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, অধ্যাপক বিউরি যথার্থই বলেছেন যে, "ম্যাসিডোনীয় বিজেতার উচ্চাশা ছিল ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি করা। সে বিচারে, এই উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়।"

তথাপি, এই অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল ছিল অত্যন্ত আপেক্ষিক। সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর কোনও স্থায়ী প্রভাব ছিল না। অন্যদিকে, ভারতের যে অংশ তিনি জয় করেন তার ওপর তাঁর অধিকারও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আর সে কারণেই স্মিথ লিখেছেন যে, "আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান সফল এক বৈদেশিক আক্রমণ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। ভারতে এর কোনও স্থায়ী প্রভাব তৈরি হয়নি।" সুতরাং ভারত ও গ্রিস—উভয়ের দৃষ্টিতে এই আক্রমণ এক 'নিষ্ফল ঘটনা।'

পরোক্ষ ফল : উপর্যুক্ত প্রত্যক্ষ ফলাফলের চেয়ে এই অভিযানের পরোক্ষ ফলাফল ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁর আক্রমণের অনিবার্য অভিঘাতস্বরূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতের জটিল মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। তিনি সেখানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি জয় করে তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করেন যা ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করে।

ঐতিহাসিক যুগের সূচনা : প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এই অভিযানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রথম ঐতিহাসিক তারিখের সন্ধান দেয়। বস্তুত এই সময় থেকেই ভারতের লিখিত ইতিহাস রচনা শুরু হয়। এবং ভারত ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করে।

মুদ্রা ও ধর্ম : ভারতীয় মুদ্রা এবং ধর্মের ওপর গ্রিক আক্রমণের প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রিক মুদ্রার অনুকরণে দেশীয় মুদ্রায় রাজার নাম, প্রতিকৃতি, উপাধি ও বিভিন্ন কারুকার্য খোদাই করার রীতি প্রচলিত হয়। গ্রিকরা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের কাছে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, গ্রিক পৌত্তলিকতার প্রভাবেই মহাযান ধর্মমতে পৌত্তলিকতার উদ্ভব ঘটে।

সাহিত্য ও শিল্পকলা : এ ছাড়াও, ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলায় গ্রিক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। গ্রিকদের কাছ থেকে ভারতীয়রা গ্রহ-নক্ষত্র, বিজ্ঞান এবং শিল্প বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। বস্তুত বরাহমিহির রচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব লক্ষণীয়। এরই সঙ্গে-সঙ্গে গ্রিক-রোমান শিল্পকলার প্রভাবে উত্তর ভারতে 'গান্ধার শিল্প'-এর বিকাশ ঘটে। নাটকের ক্ষেত্রে যবনিকা বা পরদার ব্যবহারও শুরু হয়।

ভারতে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ বলতে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকেই ধরা হয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় নতুন এক মিশ্র সংস্কৃতির।

বাণিজ্যের বিস্তার : আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সূত্রে যে যোগাযোগের পথগুলি আবিষ্কৃত হয়, তার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উল্লেখিত সময়ে ভারত থেকে বিবিধ সামগ্রী আদানপ্রদানের রীতি প্রচলিত হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল সম্পর্কিত পর্যালোচনার পরিশেষে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমকালীন ভারতে আর্থ-সামাজিক, বিশেষত সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের নিরিখে এই অভিযানের সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ভূমিকাটি অবশ্যই স্বীকার্য।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।

(উত্তরে যে-কোনও তিনটি বিষয় বা কারণ উল্লেখ করলেই চলবে।)

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারত তথা প্রাচ্যের ইতিহাস, দর্শন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখিত সময়ে প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক জটিলতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং জটিল যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ যে যুগোপযোগী ধর্মের উদ্ভব ঘটে তা 'প্রতিবাদী ধর্ম' রূপে পরিচিত। ভারতে নাস্তিক ও আস্তিক—এই দুই ধারায় প্রায় ৬৩টি ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে, যার মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম নিম্নোক্ত কারণে সবিশেষ সমাদৃত।

ধর্মীয় কারণ : বৈদিক যুগের শেষ পর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমশ জটিল ও যজ্ঞকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। যজ্ঞ ছিল ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। ফলত, সাধারণ মানুষ আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অন্যদিকে, যজ্ঞে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে পশু আহুতি ও বলি দেওয়ার রীতি ছিল। ক্রমবর্ধমান পশুহত্যার ফলে কৃষিব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ অন্য ধর্মের সন্ধান করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ভগবান বুদ্ধ ঘোষণা করেন অহিংসা পরমধর্ম এবং জীবহত্যা পাপ।

বৈদিক যুগে যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলত দীর্ঘদিন ধরে। জনসাধারণ অনুষ্ঠানে যোগদান করার ফলে তাদের দীর্ঘ সময় এবং অর্থের অপচয় হয়। আর সেই কারণেই মানুষ বৌদ্ধ ও জৈনের সহজ সরল ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বস্তুত বৈদিক ধর্মের নানাবিধ কঠোর অনুশাসন বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচনা করে।

এরই সঙ্গে সমকালীন যুগের মানুষদের মধ্যে সত্য উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা প্রবল হয়ে ওঠে। এই আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার অগ্রদূত ছিলেন পরিব্রাজক ও শ্রমণরা। তাঁরা মানুষকে অহিংসা ও তপস্যার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন।

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ

স্পষ্টতই বলেছেন যে, জন্মলগ্ন থেকেই বুদ্ধ এত পবিত্র ছিলেন, এত নির্মল ছিলেন যে, যাঁরাই তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেছিলেন, তাঁরাই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন।

সামাজিক কারণ : বৈদিক যুগের শেষ পর্বে ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সুস্পষ্ট চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাঁরা কোনও প্রকার কর দিতেন না, অপরাধের জন্য শাস্তিও পেতেন না। অন্যদিকে, বৈশ্য এবং শূদ্ররা করভারে জর্জরিত হত।

দেশ শাসনের দায়িত্ব ক্ষত্রিয়দের হাতে থাকলেও তাঁরা ব্রাহ্মণদের ন্যায় সমমর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। এমনকী বৈশ্য ও শূদ্রেরও কোনও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। উল্লেখিত সময়ে জনসাধারণ সকল বিষয়ে সম অধিকারের দাবি জানিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক নিত্য প্রবহমান স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে জলপানের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া তাঁদের পক্ষে যেন ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, ঐতিহাসিক এই মহাসন্ধিক্ষণেই সেই বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল।

বৈদিক যুগের অন্তিম লগ্নে নারীর মর্যাদা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা পূর্বের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু বুদ্ধদেব নারীদের পুরুষের ন্যায় সমমর্যাদা দান করেন। তিনি এমনকী দস্যু অঙ্গুলীমাল, পতিতা আম্রপালি—সকলকেই কাছে টেনে নেন।

অর্থনৈতিক কারণ : বৈদিক যুগের শেষভাগে লোহার আবিষ্কার তথা লাঙ্গলের ব্যবহারের ফলে কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। কৃষির সঙ্গে-সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সুবাদে সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদী ধর্মের উৎপত্তির কারণ রূপে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যা তৎকালীন সমাজে এক চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু নবোদিত ধর্মমতে আত্মসংযম এবং মাঝামাঝি পথ অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটলেও ব্রাহ্মণগণ তার বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মে বাণিজ্যিক লেনদেন, সমুদ্রযাত্রা, সুদের কারবার প্রভৃতি বিষয়কে অনুমোদন করা হয়েছে। তা ছাড়া জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের অহিংসার আদর্শ ও যুদ্ধের অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রচার ব্যবস্থা বাণিজ্য বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। যে কারণে বৈশ্যরা এই সকল ধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়ে।

ভাষাগত কারণ : বৈদিক যুগের প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত ছিল অন্যতম। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য। অন্যদিকে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে কথ্য ভাষার (পালি) ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় তাঁর ধর্মতত্ত্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

দার্শনিক চিন্তাভাবনা : ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রচলিত অলৌকিক শক্তি, ভ্রান্ত সৃষ্টি রহস্য ও তামসিক প্রথায় উপাসনার প্রতি সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। আলোচ্য সময়ে বুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ফলত জন্মান্তর এবং কর্মফল তত্ত্ব সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যানুসারে বলা হয় যে, সকলকেই কর্মফল ভোগ করতে হবে। যাগযজ্ঞ করলেও জন্মমৃত্যু এবং কর্মফল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। একমাত্র নৈতিক শুদ্ধজীবন চর্চা এই সকল পথ থেকে মুক্তি দিতে পারে। বস্তুত প্রতিবাদীরা বুদ্ধির আলোকে নৈতিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক কারণ : আলোচ্য সময়ে রাজার চরম আধিপত্য এবং কঠোর নিয়মাবলী জনগণের স্বাভাবিক গতিকে রোধ করে। অপরদিকে বুদ্ধদেব গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুত তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলি ছিল এক-একটি ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক একক।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রটেস্টান্টধর্মের উদ্ভব ঘটে, তেমনই ভারতবর্ষে আচারসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রধানত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে রাজানুগ্রহে ভারত তথা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়।

(লেখক আমতা পীতাম্বর হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক)

অঙ্ক

বিষয় : ত্রিভুজ-সংক্রান্ত উপপাদ্য

সামান্তরিক বিষয়ক উপপাদ্য ও সেগুলির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনার পর এবারের আলোচনার বিষয় ত্রিভুজ-সংক্রান্ত উপপাদ্য ও রাইডার। লিখেছেন

দীপঙ্কর সরকার

ইতিমধ্যে আমরা সামান্তরিক সংক্রান্ত উপপাদ্য, সেগুলির প্রয়োগ ও অনুশীলনী সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবারে আমরা ত্রিভুজের বাহুর মধ্যবিন্দু সংক্রান্ত দুটি উপপাদ্য এবং এই উপপাদ্য থেকে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রয়োগ করে সমান্তরাল সরলরেখা ও ভেদক সম্পর্কিত একটি উপপাদ্য নিয়ে আলোচনা করব। এই তিনটি উপপাদ্যর ওপর নির্ভরশীল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাইডার ও সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কেও আলোচনা করব।

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার উপরোক্ত তিনটি উপপাদ্য থেকে আমরা কী কী জানতে পারছি :

(i) ত্রিভুজের কোনও একটি বাহুর মধ্যবিন্দু দিয়ে অঙ্কিত সরলরেখা দ্বিতীয় বাহুর সমান্তরাল হলে সেই সরলরেখা তৃতীয় বাহুকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে এবং ত্রিভুজের বাহুদ্বয় দ্বারা সরলরেখাটির খণ্ডিতাংশ তৃতীয় বাহুর অর্ধেক হবে।

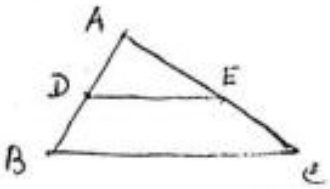

ABC ত্রিভুজের AB বাহুর মধ্যবিন্দু D.
DE ∥ BC.
E, AC-এর মধ্যবিন্দু এবং DE = ½ BC হবে

(ii) ত্রিভুজের দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।

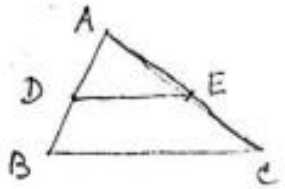

ABC ত্রিভুজের AB ও AC বাহুদ্বয়ের মধ্যবিন্দু
যথাক্রমে D ও E.
DE ∥ BC, DE = ½ BC

(iii) যদি তিনটি বা তার বেশি সমান্তরাল সরলরেখা কোনও একটি ভেদক থেকে সমান-সমান অংশ খণ্ডিত করে, তা হলে তারা অপর যে কোনও ভেদক থেকেও সমান-সমান অংশ খণ্ডিত করবে।

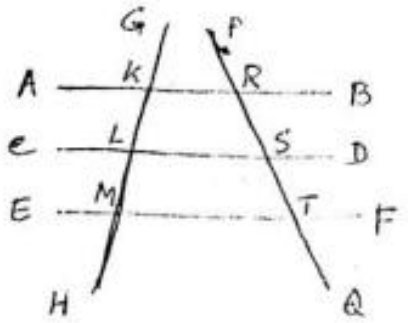

AB ∥ CD ∥ EF.
GH ভেদকের থেকে সমান্তরাল সরলরেখাগুলি
KL, LM অংশ ছিন্ন করেছে এবং KL = LM.
তা হলে RS= ST (অপর একটি ভেদক থেকে
সমান্তরাল সরলরেখাগুলি দ্বারা ছিন্ন অংশ)

এই উপপাদ্যগুলি প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত অঙ্কনের প্রয়োজন হয় এবং কীভাবে প্রমাণ করতে হবে, তা তোমাদের গণিত বইতে উপপাদ্য 23, 24 ও 25 হিসেবে দেওয়া আছে। এখানে এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নিরর্থক।

উপরোক্ত উপপাদ্যগুলি থেকে প্রাপ্ত ধর্মের ভিত্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাইডার আছে। এবারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

(1) কোনও চতুর্ভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি পরপর যুক্ত করলে যে চতুর্ভুজ গঠিত হয়, প্রমাণ করো, সেটি একটি সামান্তরিক।

স্বীকার : মনে করি, ABCD একটি চতুর্ভুজ। P, Q, R ও S যথাক্রমে AB, BC, CD ও DA বাহুর মধ্যবিন্দু।

প্রামাণ্য বিষয় : PQRS একটি সামান্তরিক।

অঙ্কন : AC যোগ করা হল।

প্রমাণ :

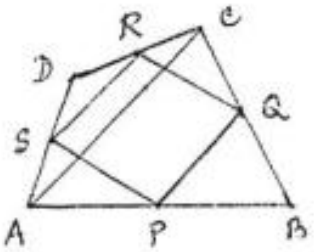

ABC ত্রিভুজের AB ও BC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q.
∴ PQ ∥ AC এবং PQ = ½ AC
অনুরূপে ACD ত্রিভুজ থেকে পাওয়া যায়, SR ∥ AC এবং SR = ½ AC.
∴ PQ ∥ SR এবং PQ = SR
∴ PQRS একটি সামান্তরিক।

(2) একটি সামান্তরিকের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি পরপর যুক্ত করলে যে চতুর্ভুজ গঠিত হয়, প্রমাণ করো, সেটি একটি সামান্তরিক।

উত্তর : এটি (1) নম্বর রাইডার যেভাবে প্রমাণ করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই প্রমাণ করতে হবে।

(3) একটি আয়তক্ষেত্রর বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি পরপর যুক্ত করলে যে চতুর্ভুজ পাওয়া যায়, প্রমাণ করো, সেটি একটি রম্বস।

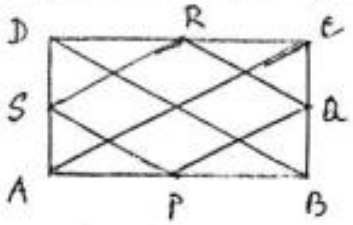

স্বীকার : মনে করি, ABCD একটি আয়তক্ষেত্র। P, Q, R ও S যথাক্রমে AB, BC, CD ও DA বাহুর মধ্যবিন্দু।

প্রামাণ্য বিষয় : ABCD একটি রম্বস।

অঙ্কন : AC ও BD যুক্ত করা হল।

প্রমাণ :

ABC ত্রিভুজের AB ও BC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q.
∴ PQ ∥ AC এবং PQ = ½ AC
অনুরূপে, ACD ত্রিভুজ থেকে দেখানো যায় যে, SR ∥ AC, SR = ½ AC
∴ PQ ∥ SR এবং PQ = SR
∴ PQRS একটি সামান্তরিক।
আবার, একই ভাবে ABD ও BCD ত্রিভুজ দুটি থেকে দেখানো যায়,
RQ = SP = ½ BD
এবারে, ABCD আয়তক্ষেত্র বলে কর্ণদ্বয় সমান অর্থাৎ, AC = BD.
∴ PQ = QR = RS = SP [∵ ½ AC = ½ BD]
∴ PQRS সামান্তরিকের প্রতিটি বাহু সমান।
আবার, APS ত্রিভুজের ∠SAP = এক সমকোণ
এবং AP ≠ AS [∵ AP = ½ AB, AS = ½ DA এবং AB ও DA আয়তক্ষেত্রের সন্নিহিত বাহু বলে AB ≠ DA]
∴ ∠APS ≠ 45°
এবারে, APS ও BPQ ত্রিভুজদ্বয়ে
AP = PB = ½ AB, AS = BQ ∴ AS = ½ AD, BQ [∵ = ½ BC এবং AD = BC]
∴ অন্তর্ভূত ∠SAP = অন্তর্ভূত ∠PBQ = এক সমকোণ
∴ △ APS ≅ △ BPQ
∴ ∠ APS = ∠ BPQ
∠ APS ও ∠ BPQ উভয়েই সূক্ষ্মকোণ এবং তাদের মান 45° নয়।
∴ ∠ APS + ∠ BPQ ≠ 90° বা এক সমকোণ

আবার, $\angle APS + \angle SPQ + \angle BPQ =$ দুই সমকোণ [সরলকোণ বলে]
$\therefore \angle SPQ = 2$ সমকোণ — $(\angle APS + \angle BPQ)$
কিন্তু $\angle APS + \angle BPQ \neq$ এক সমকোণ বলে $\angle SPQ$ সমকোণ নয়।
$\therefore$ PQRS সামান্তরিকের কোনও কোণই সমকোণ নয়।
অর্থাৎ, PQRS সামান্তরিকের প্রতিটি বাহু সমান এবং কোণগুলি সমকোণ নয়, $\therefore$ PQRS একটি রম্বস।

এ ছাড়া আরও দুটি রাইডার আছে যেগুলো উপরিলিখিত রাইডারগুলোর খুব কাছাকাছি। যেমন,

(4) একটি রম্বসের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি পরপর যুক্ত করলে একটি আয়তক্ষেত্র গঠিত হয়। প্রমাণ করো।

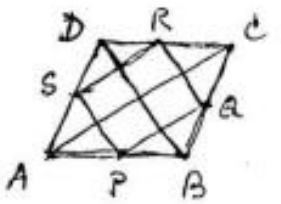

(3) নম্বর রাইডারের মতো করে দেখানো যায় PQRS একটি সামান্তরিক। রম্বসের দুই কর্ণ অসমান।
$PQ = SR = \frac{1}{2} AC$ এবং $QR = SP = \frac{1}{2} BD$ হওয়ার ফলে PQ বা SR, QR বা SQ এর সমান নয়, কারণ, $AC \neq BD$
এবারে, $\angle SPQ =$ এক সমকোণ প্রমাণ করলে PQRS আয়তক্ষেত্র হবে।
[SAP ত্রিভুজে $\angle SAP + \angle APS + \angle PSA = 2$ সমকোণ এবং PBQ ত্রিভুজে $\angle PBQ + \angle BQP + \angle QPB = 2$ সমকোণ।
$\angle SAP + \angle APS + \angle PSA + \angle PBQ + \angle BPQ + \angle QPB = 4$ সমকোণ।
আবার, $\angle SAP + \angle PBQ = 2$ সমকোণ ($\because$ রম্বসের দুই সন্নিহিত কোণ)
$\therefore \angle APS + \angle PSA + \angle BQP + \angle QPB = 2$ সমকোণ।
$\therefore 2(\angle APS + \angle QPB) = 2$ সমকোণ ($\because$ SAP ও PBQ ত্রিভুজ দুটি সমদ্বিবাহু। $AS = AP, PB = BQ$; সমান-সমান বাহুর অর্ধেক)
$\therefore \angle APS + \angle QPB = 1$ সমকোণ
আবার, $\angle APS + \angle SPQ + \angle QPB = 2$ সমকোণ (সরলকোণ বলে)
$\therefore \angle SPQ = 1$ সমকোণ।

(5) একটি বর্গক্ষেত্রর বাহুগুলির মধ্যবিন্দু পরপর যুক্ত করলে একটি বর্গক্ষেত্র গঠিত হয়। প্রমাণ করো।

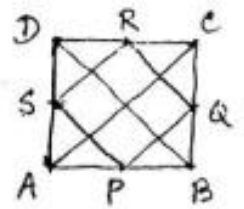

এক্ষেত্রে, আগের মতো করেই প্রমাণ করা যায়, PQRS একটি সামান্তরিক। বর্গক্ষেত্রর কর্ণদ্বয় সমান। $\therefore$ PQ, QR, RS ও SP বাহুগুলি হয় AC না হয় BD-এর অর্ধেক হওয়ার জন্য পরস্পর সমান।
আবার, APS ও BPQ সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হওয়ার কারণে $\angle APS = \angle QPB = 45^\circ$
$\angle APS + \angle SPQ + \angle QPB = 2$ সমকোণ (সরলকোণ বলে)
$\therefore 45^\circ + \angle SPQ + 45^\circ = 180^\circ$
$\therefore \angle SPQ = 90^\circ$ বা এক সমকোণ।
$\therefore$ PQRS একটি বর্গক্ষেত্র।

(6) ABC ত্রিভুজের AD মধ্যবিন্দু E. বর্ধিত BE, ACকে F বিন্দুতে

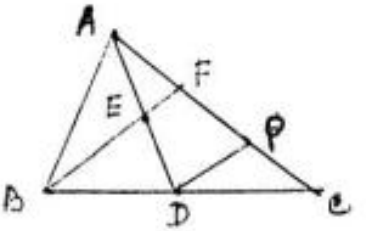

ছেদ করে। প্রমাণ করো, $AF = \frac{1}{3} AC$.
অঙ্কন : মনে করি, FC-এর মধ্যবিন্দু P. D, P যুক্ত করা হল।
প্রমাণ : BCF ত্রিভুজে D, BC-এর মধ্যবিন্দু এবং P, FC-এর মধ্যবিন্দু।
$\therefore$ DP II EF. আবার, ADP ত্রিভুজে AD বাহুর মধ্যবিন্দু E এবং EF II DP.
$\therefore$ F, AP-এর মধ্যবিন্দু।
$\therefore AF = FP = PC$ [P, FC-এর মধ্যবিন্দু স্বীকার করা হয়েছে]
$\therefore AF = \frac{1}{3} AC.$

(6) ABC ত্রিভুজে $\angle A$ সমকোণ। অতিভুজ BC-এর মধ্যবিন্দু D. প্রমাণ করো, $AD = \frac{1}{2} BC$.

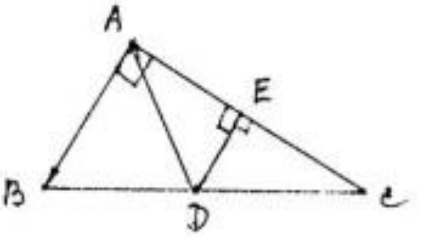

অঙ্কন : $DE \perp AC$ টানা হল।
প্রমাণ : $\angle BAC = \angle DEC =$ এক সমকোণ কিন্তু এরা অনুরূপ কোণ।
$\therefore$ BA II DE.
$\therefore$ E, AC-এর মধ্যবিন্দু [$\because$ D, BC-এর মধ্যবিন্দু এবং DAE ও DEC দুই ত্রিভুজে BA II DE]
AE=EC এবং DE সাধারণ। $\angle AED = \angle DEC =$ এক সমকোণ [$\because DE \perp AC$]
$\therefore \triangle DAE \cong \triangle DEC$,
$\therefore AD = DC$
আবার, $DC = \frac{1}{2} BC$ [$\because$ D, BC-এর মধ্যবিন্দু]
$\therefore AD = \frac{1}{2} BC.$

(8) ABCD ট্র্যাপিজিয়ামের তির্যক বাহু AD ও BC-এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E ও F. প্রমাণ করো, EF II AB এবং $EF = \frac{1}{2}(AB+DC)$.

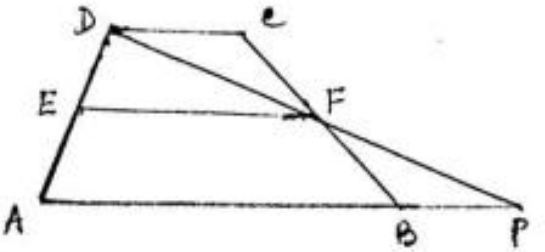

অঙ্কন : DF যোগ করে বর্ধিত করা হল যা বর্ধিত AB কে P বিন্দুতে ছেদ করল।
প্রমাণ : CDF ও BPF ত্রিভুজদ্বয়ে CF=FB [প্রদত্ত] $\angle CFD =$ বিপ্রতীপ $\angle BFP$ এবং $\angle CDF =$ একান্তর $\angle FPB$.
$\therefore \triangle CDF \cong \triangle BPF$

∴ DF=FP এবং DC=BP
আবার, DAP ত্রিভুজে E ও F যথাক্রমে DA ও DP-এর মধ্যবিন্দু
∴ DF II AP অর্থাৎ DF II AB এবং EF= ½ AP = ½ (AB + BP) = ½ (AB+DC)

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ও তার সমাধান

(i) ABC ত্রিভুজে AC=8 সেমি ও BC=6 সেমি। AB-এর মধ্যবিন্দু D থেকে BC-এর সমান্তরাল করে অঙ্কিত DE রেখা AC কে E বিন্দুতে ছেদ করে। DE ও AE-এর দৈর্ঘ্য কত?

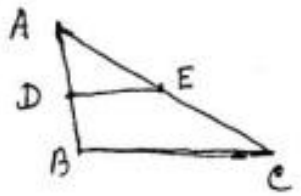

উত্তর : D, AB-এর মধ্যবিন্দু এবং DE II BC
∴ E, AC-এর মধ্যবিন্দু।
∴ AE=½ AC = 4 সেমি
DE=½ BC = 3 সেমি

(ii) ABC ত্রিভুজে P ও Q যথাক্রমে AB ও AC-এর মধ্যবিন্দু। AD মধ্যমা। PQ ও AD পরস্পরকে 0 বিন্দুতে ছেদ করেছে। BC=12 সেমি। OP=কত?
উত্তর : BD=½ BC=6 সেমি
আবার, P, AB-এর মধ্যবিন্দু এবং PO II BD
∴ O, AD-এর মধ্যবিন্দু।
∴ OP=½ BD = 3 সেমি

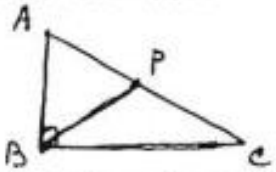

(iii) ABC ত্রিভুজে ∠B সমকোণ। P, AC-এর মধ্যবিন্দু।
AB=5 সেমি, BC=12 সেমি। BP=কত?
উত্তর : $AC^2 = AB^2 = BC^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
∴ AC=13 সেমি
আবার, BP=½ AC [পূর্বোল্লিখিত 7 নম্বর রাইডার দ্যাখো]
= ½ × 13 সেমি
= 6.5 সেমি

(লেখক পাঠভবন হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক)

ভৌ ত বি জ্ঞা ন

এককের ব্যবহার কীভাবে করবে

সময়ের সি জি এস একক সেকেন্ড, কিন্তু তোমার বয়সের হিসেব কি সেকেন্ডে করবে? না কি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মাপবে সেন্টিমিটারে? কোথায় কী একক ব্যবহার করা উচিত, জানিয়েছেন **সুখেন্দু মাইতি**

গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম মাপের একক ও পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে। বলা বাহুল্য, সে আলোচনা শেষ হয়নি। আমরা দেখেছি, কাকে বলে ভৌত রাশি, কাকে বলে স্কেলার রাশি বা ভেক্টর রাশি। বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতিতে কোন-কোন রাশির একক কী-কী, তা নিয়েও সামান্য আলোচনা হয়েছে। এবার আমরা দেখব, কোন রাশিকে কী ধরনের এককে মাপা সুবিধেজনক। তা ছাড়াও রাশি ও একক নিয়ে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনাও অবশ্যই থাকবে।

S.I. একক ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম:
(i) S.I. পদ্ধতিতে এককগুলিকে সর্বদাই একবচনে শিখতে হয়। যেমন, 4 km, কিন্তু 4 kms নয়।
(ii) এককের প্রতীক চিহ্নগুলির পরে ফুলস্টপ বা পূর্ণছেদ দিতে হয় না। যেমন km, কিন্তু km. নয়।
(iii) কেলভিন স্কেল ব্যবহারের সময় ডিগ্রি চিহ্ন (°) দিতে হয় না। যেমন, 30K, কিন্তু 30°K নয়।
(iv) দুটি এককের গুণ প্রকাশ করার সময় ওদের প্রতীকগুলি পাশাপাশি রাখতে হয়, যেমন Kg m. 1
(v) এককের ভাগের ক্ষেত্রে (/) per চিহ্নটি একবারের বেশি ব্যবহার করা যাবে না। যেমন J/Kgk, একে J Kg^{-1} k^{-1} অথবা J/Kg k রূপে লেখা উচিত। একে কখনওই j/Kg /k রূপে লেখা উচিত নয়।

• **মেট্রিক পদ্ধতির সুবিধে** : C.G.S. M.K.S এবং S.I পদ্ধতিকে মেট্রিক পদ্ধতি বলা হয়।

(i) এই পদ্ধতিতে যে কোনও একটি একক তার ঠিক পরের ছোট এককের 10 গুণ বা তার ঠিক আগের বড় এককের 10 ভাগের এক ভাগ। এই জন্য এই পদ্ধতিকে দশমিক পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতির বড় সুবিধে হল এই যে, কোনও এককে অন্য বড় বা ছোট এককে রূপান্তরিত করতে হলে শুধু দশমিক বিন্দু সরালেই কাজ হয়, বড়-বড় গুণ বা ভাগের দরকার হয় না। যেমন, 524.25 মিটারকে সেন্টিমিটার বা কিলোমিটারে প্রকাশ করতে হলে দশমিক বিন্দুটিকে ডানদিকে দু'ঘর সরালে সেন্টিমিটারে এককে পরিণত হবে এবং দশমিক বিন্দুটিকে বাম দিকে তিন ঘর সরালে কিলোমিটার এককে পরিণত হবে। যেমন

524.25 মিটার = 52425 সেমি = 0.52425 কি মি

বিভিন্ন ছোট এবং বড় এককগুলিকে বোঝাতে যে উপসর্গগুলি ব্যবহার করা হয়, তার তালিকা নীচে দেওয়া হল—

উপসর্গ	প্রতীক	অর্থ	উদাহরণ
ডেকা Deka	da	10^1	1 ডেকামিটার = 10 মি
হেক্টো Hecto	h	10^2	1 হেক্টামিটার = 100 মি
কিলো Kilo	k	10^3	1 কিলোমিটার = 10^3 মি
মেগা Mega	m	10^6	1 মেগামিটার = 10^6 মি
ডেসি Deci	d	10^{-1}	1 ডেসিমিটার = 10^{-1} মি
সেন্টি Centi	c	10^{-2}	1 সেন্টিমিটার = 10^{-2} মি
মিলি Milli	m	10^{-3}	1 মিলিমিটার = 10^{-3} মি
মাইক্রো Micro	u	10^{-6}	1 মাইক্রোমিটার = 10^{-6} মি
ন্যানো Nano	n	10^{-9}	1 ন্যানোমিটার = 10^{-9} মি
পিকো Nano	p	10^{-12}	1 পিকোমিটার = 10^{-12} মি
ফেমটো Femto	f	10^{-15}	1 ফেমটোমিটার = 10^{-15} মি

(ii) এই উপসর্গগুলির সঙ্গে গ্রাম যোগ করলে S.I বা C.G.S পদ্ধতিতে ভরের একক প্রকাশ পায়। যেমন 1 মিলিগ্রাম = 10^{-3} কিলোগ্রাম, 1 কিলোগ্রাম = 10^3 গ্রাম। এইভাবে কোনও রাশির এককের সঙ্গে কিলো, মেগা, সেন্টি, মিলি প্রভৃতি উপসর্গ যোগ করে বড় বা ছোট এককগুলিকে প্রকাশ করা যায়।

(iii) এই পদ্ধতিতে আয়তন এবং ভরের সম্পর্ক খুবই সহজ ও সরল। যেমন, 1 লিটার জলের ভর = 1 কিলোগ্রাম, অর্থাৎ জলের আয়তন যত লিটার, ওই জলের ভর তত কিলোগ্রাম।

F.P.S পদ্ধতিতে এই সুবিধেগুলি নেই বলে বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না।

রাশির মান অনুযায়ী বিভিন্ন মানের একক ব্যবহার করা হয়। কোনও রাশিকে মাপার জন্য, রাশিটির মান অনুযায়ী ছোট বা বড় একক ব্যবহার করা হয়। যেমন,

(i) একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য 20 সেমি—একে বড় একক কিলোমিটারে প্রকাশ করলে সংখ্যাটি 0.0002 কিমি হয়, অর্থাৎ খুবই ছোট হয়ে যায়। এই রকম ভগ্নাংশ দিয়ে এই দৈর্ঘ্য প্রকাশ করা অসুবিধেজনক।

(ii) বেশি দূরত্বের দৈর্ঘ্যকে কিলোমিটার এককে মাপা হয়। যেমন, কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব প্রায় 1500 কিমি। এখন এই দূরত্বকে যদি ছোট একক সেন্টিমিটারের প্রকাশ করলে ওই দূরত্ব দাঁড়ায় 150000000 সেমি। এত বড় সংখ্যা দিয়ে ওই দূরত্ব প্রকাশ করা খুবই অসুবিধেজনক।

(iii) আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা এক্স রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অথবা পরমাণুর ব্যাস মাপার জন্য খুব ছোট একক যেমন, অ্যাংস্ট্রম (10^{-8} সেমি), ফার্মি (10^{-13} সেমি) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

(iv) পৃথিবী থেকে মহাকাশের নক্ষত্রগুলি কোটি-কোটি কিলোমিটার দূরে আছে—তাই এই বিশাল দূরত্ব মাপার জন্য কিলোমিটারের পরিবর্তে আরও বড় একক আলোকবর্ষ ব্যবহার করা সুবিধেজনক।

(v) 100 মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় সময় মাপা হয় সেকেন্ডে, তাই বলে তোমার বয়স 14 বছর 5 মাসকে সেকেন্ডে প্রকাশ করলে তোমার বয়স হবে 7574400 মিনিট। এটি একটি বিরাট সংখ্যা। তাই বছরের এককে মানুষের বয়স পরিমাপ করলে ছোট সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়।

(iv) ভরের ক্ষেত্রেও ছোট মাপের ভরগুলি মিলিগ্রাম, সেন্টিগ্রাম, গ্রাম ইত্যাদি এককে এবং বড় মাপের ভরগুলি মেট্রিক টন, কিলোগ্রাম, কুইন্টাল ইত্যাদি এককে মাপা হয়।

(5) দৈর্ঘ্যের একক :

S.I. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হল মিটার (m)।

ফ্রান্সের প্যারিস শহরে আন্তর্জাতিক ব্যুরো অব ওয়েট্স অ্যান্ড মেজার্স-এর অফিসে 273 K উষ্ণতায় রাখা প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম মিশ্রিত (90 : 10) সঙ্কর ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের ওপর দুটি নির্দিষ্ট দাগের মাঝের দূরত্বকে এক মিটার বলা হয়।

মিটারের আধুনিক সংজ্ঞা : **80 ভর সংখ্যার ক্রিপটন (Kr^{86}) গ্যাসের উদ্দীপ্ত অবস্থায় কমলা-লাল বর্ণের যে আলোক বিকীর্ণ হয়, ওই আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের 1650763.75 গুণ দৈর্ঘ্য =1 মিটার**

C.G.S পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক সেন্টিমিটার। 1 মিটারের 100 ভাগের 1 ভাগকে সেন্টিমিটার বলে।

• খুব ছোট বা খুব বড় দৈর্ঘ্য মাপার একক :

উপসর্গগুলি ব্যবহার করে ছোট বা বড় দৈর্ঘ্য মাপার একক পাওয়া যায়।

(a) খুবই ছোট দৈর্ঘ্য, যেমন, **আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, এক্স রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অণু পরমাণুর ব্যাস** ইত্যাদি মাপার জন্য যে ছোট এককগুলি

কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব প্রায় ১৫০০ কিমি। এই দূরত্বকে যদি সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হয় তবে দূরত্ব দাঁড়াবে ১৫০০০০০০০ সেমি। এত বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করা যথেষ্ট দুরূহ। তাই একই রাশির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়।

উষ্ণতা বাড়লে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য বাড়ে, আবার উষ্ণতা কমলে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য কমে যায়। এর ফলে, উষ্ণতা বাড়লে বা কমলে প্রমাণ মিটারের দৈর্ঘ্যও পালটে যায়। তাই অন্য উষ্ণতায় প্রমাণ মিটারের সঠিক মাপ পাওয়া যায় না।

ব্যবহৃত হয়, তাদের কয়েকটি বিশেষ নাম আছে। যেমন :

(i) ফার্মি : 10^{-15} মিটার বা 10^{-13} সেমি দূরত্বকে 1 ফার্মি বলে। পরমাণুর ব্যাস মাপার জন্য এই একক ব্যবহৃত হয়।

(ii) অ্যাংস্ট্রম (Å) : 10^{-10} মিটার বা 10^{-8} সেমি দূরত্বকে 1 অ্যাংস্ট্রম বলা হয়। আলোকরশ্মি বা এক্সরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপতে এই একক ব্যবহৃত হয়।

(iii) মাইক্রন (μ) : 10^{-6} মিটার বা 10 সেমি দূরত্বকে 1 মাইক্রন বলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেসব বস্তু দেখা যায়, সেইগুলি মাপার জন্য এই একক ব্যবহৃত হয়।

(iv) X-একক : 10^{-11} সেমি দূরত্বকে 1 X-একক বলে।

(b) খুব বড় দূরত্ব, যেমন পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার জন্য নীচের বড় এককগুলি ব্যবহার করা হয়।

(i) অ্যাস্ট্রনমিক্যাল একক (A.U) : পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝের গড় দূরত্ব = 1 অ্যাস্ট্রনমিক্যাল একক। গ্রহ, উপগ্রহ এবং কাছাকাছি নক্ষত্রের দূরত্ব এই এককে মাপা হয়। 1 A.U. = 1.496×10^{8} কিমি প্রায়।

(ii) আলোকবর্ষ : শূন্য মাধ্যমে, এক বছর সময়ের মধ্যে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে 1 আলোকবর্ষ বলে।

1 আলোকবর্ষ = 9.467×10^{12} কিলোমিটার (প্রায়)।

(iii) পারসেক : দৈর্ঘ্যের বৃহত্তম একক হল পারসেক।

1 পারসেক = 3.26 আলোকবর্ষ = 30.84×10^{12} কিমি।

• প্রমাণ মিটারের সংজ্ঞায় একটি বিশেষ তাপমাত্রার (273 K) উল্লেখ করা হয় কেন?

উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য বাড়ে, আবার উষ্ণতা কমলে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য কমে যায়। এর ফলে, উষ্ণতা বাড়লে প্রমাণ মিটারের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, আবার উষ্ণতা কমলে দৈর্ঘ্য কমে যায়। তাই অন্য উষ্ণতায় প্রমাণ মিটারের সঠিক মাপ পাওয়া যায় না। যে উষ্ণতায় (273 K বা $0^{\circ}c$) প্রমাণ মিটারের দাগ দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেই উষ্ণতাতেই স্কেলটি 1 মিটারের সঠিক মাপ দেখায়। এই কারণে, একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য (1 মিটার) চিহ্নিত করার সময় একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার উল্লেখ করা হয়।

• প্রমাণ মিটারের সংজ্ঞায় দণ্ডটি প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সঙ্কর ধাতুর তৈরি—এ কথা উল্লেখ করা হয় কেন?

একই উষ্ণতায় রাখা সমান দৈর্ঘ্যের কিন্তু বিভিন্ন উপাদানের (যেমন পিতল ও লোহা) দুটি দণ্ড নিয়ে যদি ওদের উষ্ণতা বাড়িয়ে অন্য এক উষ্ণতায় আনা হয়, তা হলে দেখা যাবে যে, দণ্ডদুটির দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হচ্ছে। কারণ একই উষ্ণতার পার্থক্যে বিভিন্ন উপাদানের বস্তুর প্রসারণ বা সঙ্কোচন বিভিন্ন হয়। এই কারণে, দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট উপাদানের প্রয়োজন হয়। প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম মিশ্র ধাতু হল ওই নির্দিষ্ট উপাদান।

তা ছাড়া, প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সঙ্কর ধাতু দিয়ে তৈরি দণ্ডটির ক্ষয় খুব কম হয়, ফলে দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

(6) ক্ষেত্রফল ও আয়তনের একক :

ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের একক, দৈর্ঘ্যের একক থেকে গঠন করা যায় বলে এদের একক হল লব্ধ একক।

(1) **ক্ষেত্রফলের একক :**

(a) **S.I পদ্ধতিতে** ক্ষেত্রফলের একক হল বর্গমিটার। যে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য এক মিটার তার ক্ষেত্রফলকে এক বর্গমিটার বলে।

(b) **C.G.S পদ্ধতিতে** ক্ষেত্রফলের একক হল বর্গসেন্টিমিটার। যে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার , তার ক্ষেত্রফলকে এক বর্গ সেন্টিমিটার বলে।

1 বর্গমিটার = 10^{4} বর্গসেন্টিমিটার।

• কয়েকটি সুষম বস্তুর ক্ষেত্রফল :

r ব্যাসার্ধের **বৃত্তাকার চাকতির উপরিতলের ক্ষেত্রফল** = πr^2

l দৈর্ঘ্য এবং b প্রস্থ বিশিষ্ট **আয়তাকার পাতের ক্ষেত্রফল** = l×b

r ব্যাসার্ধের **গোলকের উপরিতলের ক্ষেত্রফল** = $4\pi r^2$

l দৈর্ঘ্য এবং r ব্যাসার্ধের = **বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল** = $2\pi r l$

(2) আয়তনের একক :

(a) S.I. পদ্ধতিতে আয়তনের একক হল **ঘনমিটার। এক মিটার দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট ঘনকের আয়তনকে এক ঘনমিটার বলে।**

(b) C.G.S পদ্ধতিতে আয়তনের একক হল ঘন সেন্টিমিটার। **এক ঘন সেন্টিমিটার দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট ঘনকের আয়তনকে এক ঘন সেন্টিমিটার বলে।**

1 ঘন মিটার = 10^{6} ঘন সেন্টিমিটার।

(c) লিটার : $4^{\circ}c$ উষ্ণতায়, এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ জলের আয়তনের এক লিটার বলে।

1 লিটার = 1000 ঘন সেন্টিমিটার = 1 ঘন ডেসিমিটার
= 0.001 ঘনমিটার

• লিটারের সংজ্ঞায় $4^{\circ}c$ উষ্ণতার উল্লেখ থাকে কেন?

$4^{\circ}c$ উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, তাই এই উষ্ণতায় এক কিলোগ্রাম জলের আয়তনকে এক লিটার ধরা হয়। এখন জলের উষ্ণতা $4^{\circ}c$-এর কম অথবা বেশি হলে জলের ঘনত্ব কমে যায় ফলে, বিশুদ্ধ এক কিলোগ্রাম জলের আয়তন বেড়ে 1 লিটারের বেশি হয়ে যায়। তাই লিটারের সংজ্ঞা বলার সময় $4^{\circ}c$ উষ্ণতার কথা উল্লেখ করতেই হয়।

• কয়েকটি বিভিন্ন আকারের ঘন, বস্তুর আয়তন নির্ণায়ক সূত্র :

(i) **আয়তাকার প্লেটের আয়তন** = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = l×b×h

(ii) **ঘনকের আয়তন** = $(\text{দৈর্ঘ্য})^3 = l^3$

(iii) **গোলকের আয়তন** $4\pi/3 \times (\text{ব্যাসার্ধ})^3 = 4\pi r^3/3$

(iv) **বেলনের আয়তন** = $\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2 \times \text{উচ্চতা} = \pi r^2 h$

(v) **শঙ্কুর আয়তন** = $(1/3)\pi$ (ভূমির ব্যাসার্ধ)^2 × উচ্চতা = $(1/3)\pi r^2 h$

এবার আমাদের আলোচনা তা হলে এ পর্যন্তই। আগামী সংখ্যায় আবার রাশি ও একক নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করা যাবে।

(লেখক স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের ভৌতবিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক)

ছবি:দেবাশিস দেব

আগে যা ঘটেছে : চুরি-যাওয়া একটি বহুমূল্য মূর্তি উদ্ধারের কাজে পাণ্ডব গোয়েন্দারা যায় রাজবলহাটি। সেখানে মূর্তিমান শয়তান কালো দত্তকে দেখে তারা হতবাক। বাঁকড়ায় ঝিজলা আর তাঁর বানর মানকুমারীকে নিয়ে শুরু হল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযান। এক অন্ধকার পাতালঘর থেকে উদ্ধার হল প্রচুর বিস্ফোরক, লুঠের জিনিস ও পুরনো অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি। এর পর বাবলুর ঘরে বসে শুরু হল শলা-পরামর্শ। বাবলু বলল, সমস্ত রহস্যের কেন্দ্রে আছে খলনায়ক অবর দত্ত। তারপর থানা থেকে বিগ্রহ উদ্ধার করে বাবলুরা বাড়ি ফিরে এল। এর পর....

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

১৬

ঘরের মধ্যে দারুণ এক নিস্তব্ধতা। অরুণবাবু মাধাই ঘোষ সম্বন্ধে কী বলবেন তা উনিই জানেন। সব ভালভাবে জানতে পারলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সুবিধে হয় কাজের। ওরা তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল অরুণবাবুর মুখের দিকে।

মা চা বিস্কুট নিয়ে এলেন। তারপরই নিয়ে এলেন উপাদেয় সব জলখাবার। টানটান উত্তেজনার মধ্যে এইরকম কিছুর প্রয়োজন আছে।

খেতে খেতেই অরুণবাবু বললেন, "শোনো বাবলু, ওই মাধাই ঘোষ হল আমার জীবনের এক দুষ্টগ্রহ। আমরা একই কলেজে পড়াশোনা করতাম। ও ছিল অত্যন্ত বদ প্রকৃতির। ওর কারণে কলেজ-পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মেয়েদের গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত, ছেলেদের ব্লেড মারত। জ্বালিয়ে মারত একেবারে।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ। একবার হল কী, নতুন ভর্তি হওয়া একটি মেয়ের সঙ্গে অশোভন আচরণ করার প্রতিবাদে ওকে ধরে বেধড়ক পেটালাম আমি। আমার সঙ্গে আরও দু-একজন যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ওর যত রাগ পড়েছিল আমার ওপর। তা সে যাই হোক, কলেজ-জীবন শেষ হলে আমি আমার পিতৃপুরুষের ব্যবসার কাজে নিজেকে সবসময়ের জন্য নিয়োগ করলাম। মাধাইও চলে গেল লন্ডনে ওর এক রিলেটিভের কাছে। সেখানে কী একটা কাজকর্ম পেয়ে রয়ে গেল বরাবরের মতো। এখানে ওর কয়েকজন বদ সঙ্গী ছিল। তারাও ওই একই কলেজে পড়ত। পরে অবশ্য তারা তাদের সংশোধন করে নিয়েছিল। তাদেরই সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হলে মাধাই ঘোষের খবরাখবর পেতাম। এবং ক্রমশ ও যে একটা দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালে রূপান্তরিত হয়েছিল সে খবরও পেয়েছিলাম। এইভাবে বছর পনেরো কেটে যাওয়ার পর একদিন হঠাৎই গাড়ি নিয়ে আমার দোকানে এসে হাজির হল মাধাই ঘোষ। ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'কী খবর মাধাই?' ও বলল, 'বহুদিনের পুরনো বন্ধু তুমি। তাই কলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তোমার ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে বলো?' আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম ধূর্ত শেয়াল কোনও একটা মতলব এঁটেই এসেছে এখানে। বললাম, 'বাজার খুব মন্দা ভাই। কোনওরকমে টিমেতালে চলছে সব। এদেশে এখন সোনার চেয়ে টাকা দামি। পাঁচ বছর, ছ' বছরে টাকা ডবল হয়ে যাচ্ছে। তাই সোনা বেচে লোকে টাকা রাখছে পোস্ট অফিসে। তা ছাড়া চুরি ডাকাতি ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় সোনার গয়না মেয়েরা আজকাল ভয়ে পরতে চায় না।' আমার মুখে সবকিছু শোনার পরও মাধাই বলল, 'তবুও সোনা কি লোকে কিনছে না? বিয়েটিয়ের ব্যাপারে না কিনলে চলবে কী করে? তা যাক, আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তুমি তো জানো, আমার মতো সৎ চরিত্রের আদর্শবান ছেলে ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই। তা আমার স্মাগলিং বিজনেসে তুমি একটু সাহায্য করো। বেশ কিছু সোনার বাঁট আছে আমার কাছে। সেগুলো তুমি কিনে নাও। আধা মূল্যে দিয়ে দেব। নকল সোনা নয় কিন্তু। ভালভাবে যাচাই করে তারপর কিনো।' আমি বললাম, 'ওইসব গোলমেলে ব্যাপারে আমি নেই। তুমি বরং অন্য কোথাও তোমার টোপ ফেলো।' মাধাই ঘোষ হেসে বলল, 'বেশি সততা আমাকে দেখিও না ভাই। গোয়ালা আর মণিকার কী জিনিস তা দুনিয়াসুদ্ধু লোক জানে। তাই বলি সুবোধ বালকের মতো লাইনে এসো।' আমি দারুণ অপমানিত হয়ে বললাম, 'কই দেখি তোমার জিনিসপত্র?' ও বলল, 'আরে জিনিসপত্র কি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি? কাল সন্ধেবেলা আমি আসব। তিন লাখ টাকা তুমি রেডি রেখো। দশ লাখ টাকার জিনিস পাবে। এক লাখ টাকার বান্ডিল দেবে, দশ লাখ টাকার জাল নোট পাবে। আসলে জোচ্চুরি জালিয়াতি এগুলোকে মনে করলেই মনে করা। তুমি আমি কেউই থাকব না পৃথিবীতে। শুধু দু'হাতে সবকিছু নাড়াচাড়া করে ভোগদখল করে এখান থেকে চলে যাওয়া। কিছুই

কে জানত যে, এই রাতদুপুরে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারেও একটা পেতনি ভর করবে ওদের ওপর।

তো নিয়ে যেতে পারব না এখান থেকে। এমনকী, এই দেহটাকেও নিয়ে যেতে পারব না। তা হলে ভয়ই বা কিসের? আর চুরি করাই বা হল কোথায়? যা-যা উপার্জন করব তার সবই তো রয়ে যাবে এখানে। অতএব বলি ভাই হাতে হাত মেলাও।' আমি গায়ের রাগ গায়ে চেপে মুখে নকল হাসি এনে বললাম, 'সত্যি, তোমার মতো এত সহজভাবে আমি কিন্তু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কখনও ভাবনাচিন্তা করিনি। আমি রাজি। কাল সন্ধেবেলা তুমি তা হলে আসছ?' টাকা আমি রেডি রাখব।' মাধাই ঘোষ আমার হাতে হাত মিলিয়ে চলে গেল। আর আমিও আমার দিক থেকে যা-যা করবার তা করে রাখলাম। অর্থাৎ পুলিশকে আগাগোড়া ব্যাপারটা সব জানিয়ে ওকে হাতেনাতে ধরবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রাখলাম একটা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল সব। এই পর্যন্ত শোনার পর বাবলু বলল, "তারপরে কী হল? ধরা পড়ল মাধাই ঘোষ?"

"না। পরদিন সন্ধেবেলা আমার দোকানে একটা ফোন এল। মাধাইয়েরই ফোন। ও জানাল, 'তোমার মতো বোকা আর দুটো দেখিনি ভাই। এমন অফার কেউ ছেড়ে দেয়? শুধু শুধু পুলিশকে ফোন করতে গেলে কেন? তোমার কি ধারণা আমি এমনই বোকা যে, ওইসব জায়গায় আমার স্পাই না রেখে আমি এই কারবারে নেমেছি? আপাতত শেঠ প্রভুদয়ালের সঙ্গে যা করবার তা করে নিলাম। তবে আমাকে ঘাঁটিয়ে কিন্তু ভুল করলে। আমি হলুম একটা গোখরো সাপ। এমন ছোবল দেব যে, বিষের জ্বালায় ছটফট করবে তুমি?' "

"তারপর?"

"তারপর ওর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কতবার ধরা পড়ছে, কতবার বেরিয়ে আসছে। সারা পৃথিবী তোলপাড় করছে ও। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বদেশের মধ্যেই নাশকতার কাজ করছে। ওর মৃত্যুর সংবাদও আমার কানে এসেছে। তবে মনে হয় এ-সবই সাজানো ঘটনা। তাই তোমাদের মুখে ওই নাম শুনেই শিউরে উঠেছি আমি। এবং আমার মনে হয় ওই সাধুবাবা আর কেউ নন, শয়তান মাধাই ঘোষেরই ছদ্মরূপ।" পাণ্ডব গোয়েন্দারা একবাক্যে বলল, "আমাদেরও তাই মনে হয়। এবং সেই কারণেই মেয়েটাকে অপহরণ করার পরও ওরা কোনও টাকাপয়সার দাবি করেনি।"

মা এতক্ষণ অদূরে থেকে ওদের কথাগুলো শুনছিলেন সব। বললেন, "ওই সাধুবাবা যদি মাধাই ঘোষই হবেন তা হলে মেয়েটাকে গাড়ি করে কালো দত্তর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবেন কেন? ওঁর কি টাকার অভাব?"

বাবলু বলল, "না। মেয়েটাকে অপহরণ করে কালো দত্তর ডেরায় পৌঁছে দেওয়া হল ওকে যথাস্থানে অর্থাৎ ওদের গোপন ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর অ্যাটাচিতে করে উনি টাকাই নিয়ে এলেন বা অন্য কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য কিছু তাই বা কে জানে?"

দিওতিমার মা এবার বাবলুর হাত দুটি ধরে বললেন, "তা সে যাই হোক, আমাকে কথা দাও বাবলু, আমার মেয়েকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে?"

বাবলু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

সস্ত্রীক অরুণবাবু চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "এইবার আমরা আমাদের আসল তদন্ত শুরু করব।"

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল দশটা।

॥ ১০ ॥

ঠিক এই মুহূর্তে বাবলু কী করে তাই দেখার জন্য বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তাকাল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু তখন ওর ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত।

বিলু বলল, "তুই কি এখনই বেরোতে চাস?"

"হ্যাঁ। তোরা যদি যেতে চাস তো রেডি হয়ে নে। আর ঘ্যাঁগোদের বল, ওদের

আর রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। আমরা আজকালের মধ্যেই ফিরব। ওরা যেন আমাদের বাড়িগুলোর দিকে একটু নজর দেয়। যদি আমাদের ফিরতে কোনও কারণে দেরি হয় তা হলে ওরা যেন আমাদের অপেক্ষা না করে ঠিক দিনেই পৌঁছে যায় হাওড়া স্টেশনে। অরুণবাবুর কথার খেলাপ যেন কোনওভাবেই না হয়। এই সুযোগ একবার চলে গেলে আর কিন্তু আসবে না।"

মা বললেন, "কোথায় যাবি তোরা?"

"জয়চণ্ডী পাহাড়ে। কেননা ওই জায়গাটাই রহস্যের মূল কেন্দ্র এখন। ওই গুরুদেবের আশ্রম, গুরু হনুমান, দেবাংশুর নজরবন্দি হয়ে থাকা সব কিছুতেই জয়চণ্ডী পাহাড়।"

"কিন্তু ওরা কি এতই বোকা যে, এত কাণ্ডের পরও ওখানে বসে থাকবে?"

"না। আমরা ওখানে যাচ্ছি অন্য কারণে। ওইখানে গিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের তদন্তের কাজ শুরু করলেই আমরা জেনে যাব ওদের আসল ঘাঁটি কোনখানে।"

মা'র সঙ্গে কথা বলা শেষ করে বাবলু থানায় একবার ফোন করল। অফিসার নিজেই ধরেছিলেন ফোনটা।

বাবলু বলল, "সার, আমরা কয়েকদিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। আমাদের বাড়ির দিকে একটু নজর দেবেন। দুষ্কৃতীদের মুখ থেকেই জেনেছি কালোবরন দত্ত এখন হরিবিলাস ভক্ত সেজে রায়বাহাদুর রোডে সুখনিবাসে বিরাজ করছেন। অতএব ওদিকেও নজর রাখবেন একটু।"

অফিসার বললেন, "তা হলে তোমাকে একটা সুখবর দিই, কালো দত্ত এখন পুলিশের হেফাজতে।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "সত্যি!"

"হ্যাঁ। তবে ওইসঙ্গে একটা খারাপ খবরও দিই, উনি এখন বদ্ধ উন্মাদ।"

"এটা কী করে সম্ভব? শয়তানের কোনও চাল নয় তো?"

"না। তারাতলা ব্রিজের ওপর থেকে উনি লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথচারীরা ওঁকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। উনি এখন কলকাতা পুলিশের হেফাজতে।"

"কিন্তু...।"

"ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।"

"আমি কিন্তু এর মধ্যে অধর দত্ত আর মাধাই ঘোষের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।"

"তোমার অনুমান যথার্থই। কোনও খারাপ ইনজেকশনের প্রভাবেই সম্ভবত ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। এবং এই কুকর্ম ওই দু'জন ছাড়া আর কেই-বা আর করতে পারে?"

বাবলু টেলিফোন রেখে কারও দিকে না তাকিয়ে দু'চোখ বুজে সোফায় বসে দেহটা এলিয়ে দিল। ওর কপালে মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বাবলু একটু প্রকৃতিস্থ হলে বিলু বলল, "কী হল রে বাবলু?"

"কালো দত্তর খেলা শেষ।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে? আমরা কি যাব না?"

"অবশ্যই যাব। যেতে আমাদের হবেই। তবে কিনা খুবই ধূর্ততার সঙ্গে।" বলে পুলিশের সঙ্গে যা-যা কথা হয়েছিল সবই বলল বাবলু।

ওর কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই।

বিচ্ছু বলল, "তুমি যা শোনালে তা তো রীতিমত ভয়ের ব্যাপার। ওই ইনজেকশন দিয়ে দেবাংশু আর দিওতিমাকেও ওরা পাগল করে দেবে না তো?"

"এতক্ষণে যে দেয়নি তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? শুধু তাই নয়, এই অভিযানে আমরাও যদি কেউ কোনওরকমে ধরা পড়ি ওদের হাতে তা হলে কিন্তু আমাদের অবস্থাও ওইরকমই করুণ হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি ভাই যাচ্ছি না, তোরা যা। আমাকে কেউ খুন করতে চাইলে আমি রাজি আছি। কিন্তু পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব আর উলটোপালটা কথা বলে লোক হাসাব, ও আমার দ্বারা হবে না।"

বাবলু বলল, "শোন, আমাদের এবারের এই অভিযানটা কিন্তু অন্যবারের মতো নয়। ওখানে দল বেঁধে আমরা পাঁচজনে একসঙ্গে গেলেই কিন্তু ওরা চিনে ফেলবে। তাই বলি কি, বাচ্চু, বিচ্ছুরও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। বিলু আর আমি যাই। গিয়ে ওখানকার পরিবেশ দেখি, অবস্থাটা বুঝি। তারপর ফোনে খবর দিলেই পঙ্কুকে নিয়ে হাজির হবি তোরা।"

বিলু বলল, "কাজটা তাতে পাকা হবে। এটুকু জেনে রাখিস, ওরা কিন্তু আমাদের সবাইকেই গ্রাস করবার জন্য হাঁ করে বসে আছে ওখানে।"

বাবলু, বিলু দু'জনেরই কথায় এবারের অভিযানের গুরুত্বটা বুঝল সকলে।

বিচ্ছু বলল, "তোমরা তা হলে গিয়েই ফোন কোরো। আমরা রেডি থাকব।"

বাচ্চু বলল, "ঘটনার গতি যা, তাতে শুধু জয়চণ্ডী নয়, মনে হচ্ছে দূরেও কোথাও যেতে হবে আমাদের। বাবলুদারা আগেভাগে গিয়ে দেখুক, তারপর—।"

বিলু বলল, "আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসি?"

বাবলু বলল, "না।"

"সে কী! যাবি না?"

"যাব। তবে এখনই নয়। বেলা অনেক হয়েছে। স্নান-খাওয়া সেরে দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে রাতের চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে যাব। শেষরাতে নেমে পড়ব আদ্রা স্টেশনে। ওখান থেকে রঘুনাথপুরে গিয়ে কাল সকালেই জয়চণ্ডী পাহাড়।"

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর আর নড়চড় হওয়ার নয়। অতএব সবাই বিদায় নিল একে একে।

রাত্রিবেলা বাবলু আর বিলু দু'জনেই এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। সেকেন্ড ক্লাসের দুটো টিকিট কেটে ওরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেক বগি নিয়ে ধীর শ্লথগতিতে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকল ট্রেনটা। বেশ কয়েকটি থ্রি-টিয়ার স্লিপার কোচও আছে।

বিলু বলল, "এমন জানলে দুটো রিজার্ভেশনও করিয়ে নিতাম রে। দিব্যি আরামে শুয়ে শুয়ে যাওয়া যেত।"

বাবলু বলল, "একটু চেষ্টা করে দেখলে হয়। অনেক স্লিপার কোচ আছে দেখছি। এর একটাতেও কি জায়গা হবে না আমাদের?"

"হওয়া তো উচিত। এ তো আর মুম্বই চেন্নাই মেল নয়, কোথাও না কোথাও দুটো বার্থ পাওয়া যাবেই।"

অতএব ওরা সাধারণ বগিতে না উঠে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল।

অল্পবয়সী সি.এ চার্ট দেখে বললেন, "এস ফোর-এ হয়ে যাবে। চব্বিশের পর থেকে যে-কোনও দুটো বার্থ তোমরা পছন্দ করে নাও। ট্রেন ছাড়লে আমি যাচ্ছি।"

বাবলু আর বিলু মনের আনন্দে একটা লোয়ার আপার বার্থ পছন্দ করে নিল। শুধু ওরা নয়, ওদের মতো তাৎক্ষণিক রিজার্ভ করা অনেক যাত্রীই উঠল ওদের বগিতে। দেখতে দেখতে সবক'টি বার্থই যাত্রীতে ভরে গেল।

ট্রেন ছাড়লে জানলার ধারে বসে অন্ধকারের প্রকৃতি দেখতে লাগল দু'জনে। টিকিয়াপাড়া, দাশনগর, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, একের পর এক স্টেশন পার হতে লাগল। অনেকেই বাড়ি থেকে নিয়ে আসা রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন। যাদের সঙ্গে ছোট ছেলেপুলে ছিল তারা অনবরত কলকল করতে লাগল।

বাবলু এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে এসেছিল। তাই খেয়েই শুয়ে পড়ল দু'জনে। আসবার আগে বাড়িতে লুচি আর আলুর দম খেয়েছিল পেটভরে, তাই গাড়ির খাবারের প্রয়োজন হল না।

বিলু বলল, "আমার কিন্তু সকলের জন্য মনখারাপ করছে খুব।"

"আমারও। আসলে আমরা তো এইভাবে দলছুট হয়ে রাতের গাড়িতে

ট্রেন জার্নি করিনি কখনও। বিশেষ করে পঙ্কুর জন্য মনখারাপ হচ্ছে খুব। ও বেচারি ট্রেনে চাপার জন্য পাগল।"

বাবলুর কথা শেষ হতেই ওপাশের বার্থ থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমিও তোমার জন্য পাগল। সরি, তোমার একার জন্য নয়। তোমাদের সকলের জন্য। আমার কী সৌভাগ্য যে, পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুর সঙ্গে আমি এক কামরায় যাচ্ছি। নীচের জন নিশ্চয়ই বিলু?"

যাঃ। ধরা পড়ে গেল। তবুও বাবলু ঘুরে তাকিয়ে বলল, "তুমি!"

"আমার নাম রিমা। রিমা সেন। উত্তর কলকাতায় মেয়েদের হস্টেলে থেকে বেথুনে পড়ি। আজ আমার আসবার কোনও ঠিকই ছিল না। হঠাৎই দুপুরবেলা বাড়ির জন্য মনটা কেমন করে উঠল, তাই বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে এসে রিজার্ভেশনও পেয়ে গেলাম একটা। না হলে অবশ্য লেডিজ কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়তাম। তবে যা আজকাল ট্রেনের অবস্থা তাতে, বিশেষ করে নাইট জার্নিতে লেডিজ কামরায় উঠতে ভয় করে।"

বাবলু বলল, "তুমি কতদূর যাবে?"

"আদ্রা। তোমরা?"

"আমরাও তাই যাব। সেখান থেকে রঘুনাথপুর।"

"কোনও আত্মীয় আছে বুঝি?"

"না না, এমনিই। বেড়াতে যাচ্ছি।"

"বুঝেছি। তোমরা জয়চণ্ডী পাহাড়ে যাচ্ছ। কিন্তু এইভাবে তোমরা দলছুট হয়ে তো কোথাও যাও না? অন্তত তোমাদের কাহিনী পড়ে তাই মনে হয়।"

"আসলে আমরা যাচ্ছি একটা লোকেশান দেখতে।"

রিমা শুয়ে ছিল, এবার উঠে বসল। বলল, "তার মানে? তোমরা সিনেমা করছ নাকি?"

"আরে না, না। আমরা দিনকতকের জন্য একটু শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশের বাইরে থাকতে চাই। এমন এক জায়গায়, যেখানে কেউ আমাদের চিনে ফেলবে না, বিরক্ত করবে না। তাই কে যেন একজন জয়চণ্ডী পাহাড়ের নাম করল। বলল, কাছাকাছি রঘুনাথপুরে থাকারও নাকি জায়গা আছে। সেই কারণেই এসেছি। জায়গা পছন্দ হলে আমরা ফোনে খবর দেব ওদের। ওরা হইহই করে চলে আসবে।"

"ভালই হবে। অমনি আমিও ভিড়ে যাব তোমাদের সঙ্গে।"

ওদের কথোপকথনের ফাঁকেই কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে সেকেন্ড ক্লাস টিকিট স্লিপার ক্লাসে রূপান্তরিত করে বার্থ দিয়ে দিলেন।

রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলল।

একবার ঘুম চটকে গেলে সহসা ঘুম আসে না বাবলুর। কে জানত যে এই রাতদুপুরে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারেও একটা পেতনি ভর করবে ওদের ওপর।

ট্রেন খড়্গপুরে এসে থামল।

বিলু উঠে বসতেই মেয়েটি নেমে এল ওর বার্থ থেকে। তারপর বিলুর মুখোমুখি বসেই বলল, "ট্রেনজার্নিতে আমার একদম ঘুম আসে না। অথচ এক-একজন লোক নাক ডাকিয়ে এমন ঘুমোয় যে, রাগ ধরে যায়।"

বিলু বলল, "আমার কিন্তু ট্রেনের দুলুনিতে ভালই ঘুম হয়। তবে এটা একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি তো। তেমন গতি নেই, তাই ঘুম আসতে চাইছে না।"

"তোমাদের হিরো মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর কোনও সাড়াশব্দ নেই।"

"ঘুমোক। আমি কিন্তু ঘুমোচ্ছি না। আসলে এই লাইনে আমাদের যাতায়াত নেই। অনেকদিন আগে একবার বিষ্ণুপুর যাওয়ার সময় এসেছিলাম এই পথে। তা সেবার ডাকাতের পাল্লায় পড়ে সে কী কাণ্ড।"

"এবারেও যদি ওইরকম হয়।"

"লড়ে যাব।"

ট্রেন এবার মেদিনীপুর, শালবনি, চন্দ্রকোনা রোড, একের পর এক স্টেশনে থেমে থেমে এগোতে লাগল। চন্দ্রকোনা রোডে ট্রেন থামলে রিমা বলল, "আমাদের দেশ এখানে। কাছেই গড়বেতা। ফের কখনও সময় সুযোগ হলে একবার গড়বেতায় নেমে গনগনির খুলাটা দেখে যেও।"

বিলু বলল, "সেইরকম ইচ্ছে অবশ্য আমাদের আছে। তবে কিনা সময় ও সুযোগটা হয়ে উঠছে না।"

এইভাবেই রাত শেষ হয়ে ভোর হল। সামান্য একটু লেট করে ট্রেন যখন আদ্রা স্টেশনে এল তখন সকাল হয়ে গেছে।

ট্রেন থেকে নেমে রিমা বলল, "তোমাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে।"

বাবলু বলল, "কী।"

"সারারাত একসঙ্গে ট্রেন জার্নি করে এলাম। আমি যেমন ক্লান্ত তেমনই তোমরাও। কাছেই আমাদের কোয়ার্টার। চলো ওখানে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপরই জয়চণ্ডীর দিকে যাও। তোমরা চাইলে আমিও তোমাদের সঙ্গ দিতে রাজি আছি। তোমরা তো এই প্রথম আসছ, তাই আমি সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে তোমাদের। ওখানকার সবাই প্রায় চেনে আমাকে।"

বাবলু বিলুর দিকে তাকালে বিলু ইশারায় রাজি হতে বলল বাবলুকে।

রিমা দারুণ উল্লসিত হয়ে ওদের নিয়ে গেট-এর দিকে এগোতেই একজন মধ্যবয়সী চেকার ছুটে জড়িয়ে ধরলেন রিমাকে। বললেন, "হ্যাঁ রে মা, এইভাবে হঠাৎ করে চলে এলি যে? একটা খবর দিবি তো?"

রিমা প্রণাম করে বলল, "তোমাদের জন্য খুব মনখারাপ করছিল বাবা। আসবার সময় পথে এই বন্ধুদের পেলাম। একটু পরে ওদের নিয়ে জয়চণ্ডীতে যাব।"

জয়চণ্ডীর নাম শুনেই কেমন যেন হয়ে গেলেন রিমার বাবা। বললেন, "জয়চণ্ডীতে যাবি? ওখানে এখন না যাওয়াই ভাল। খুব গোলমাল চলছে ওখানে।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কিসের গোলমাল?"

"ওসব কথা এখন থাক। এখানে ওসবের আলোচনা না হওয়াই ভাল। তোমরা ঘরে যাও।"

রিমা ওদের নিয়ে কোয়ার্টারের দিকে এগোল।

॥ ১১ ॥

আর সমস্ত রেল কোয়ার্টার যেমন হয় রিমাদের কোয়ার্টারও তার ব্যতিক্রম নয়। চারতলায় টু-রুম-এর ফ্ল্যাট। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নয়। সে যাই হোক, বাবলুরা তো এখানে থাকতে আসেনি। চলার পথে সাময়িক বিশ্রাম।

রিমার মা মেয়েকে দেখে যেমন খুশি হলেন তেমনই আনন্দ পেলেন

বাবলু ও বিলুকে পেয়ে।

একটু পরে বাবাও এলেন।

এই সকালেই বাবলু,বিলু রিমাদের বাথরুমে স্নানপর্ব সেরে নিয়ে রাতের ট্রেন জার্নির ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর করে নিল।

মা ওদের সকলের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন।

বাবা বললেন, "তোমরা কি জয়চণ্ডীতে যাবেই ঠিক করেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ওখানে যাব মন করেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছি।"

"গেলে একটু সাবধানে যেও। শুনেছি ওখানকার সাধুদের নিয়ে কীসব যেন গোলমাল চলছে। পুলিশ গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে অ্যারেস্টও করেছে কয়েকজনকে।"

"কারণটা কী?"

"তা জানি না। তবে একটি কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরেই ওখানে উত্তেজনা। গ্রামবাসীরাও প্রচণ্ড খেপে আছে এই ব্যাপারে।"

বাবলুর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এই কিশোর নিশ্চয়ই রেবাদির ভাই।

বিলু চাপা গলায় বলল, "কী করবি রে বাবলু?"

"যাব। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপ হয়েছে, তবুও সব কিছু একবার যাচাই করে দেখা দরকার। কে ওই কিশোর তা সঠিকভাবে না জেনে তো কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।"

রিমার বাবা বললেন, "তোমাদের কথাবার্তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "আমরা অন্য একটা ব্যাপারে আলোচনা করছি।"

রিমা কিন্তু বুঝল সব। অকারণে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কেউ কোথাও যাবে ও তা বিশ্বাস করে না। ওরা যে এই হত্যারহস্যের কিনারা করতেই এখানে ছুটে এসেছে সে ব্যাপারেও দারুণভাবে নিশ্চিন্ত হল। তাই বাবাকে বলল, "যেখানে যা কিছুই হোক না কেন তাতে আমাদের কী? পুলিশ যদি যেতে না দেয় তা হলে ফিরে আসব। আর যদি দেখি কোনও ডিসটার্ব নেই তা হলে মন্দিরে পুজো দিয়ে পাহাড়ে উঠে ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

বাবা বললেন, "বেশি দেরি করিস না তা হলে। সারারাত ট্রেন জার্নি করে এসেছিস। তার ওপরে এই চনচনে রোদ। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ছেলেদুটোরও একটু রেস্টের দরকার।"

বাবলু বলল, "তবে একটা কথা। আমাদের জন্য কোনও আয়োজন করে রাখবেন না।"

মা বললেন, "সে কী! কেন?"

"আমরা জয়চণ্ডী দেখে আর এদিকে ফিরব না। আসানসোলে আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি আছে, সেখানেই চলে যাব।"

বাবা বললেন, "অবশ্যই যাবে। তবে কিনা আজ নয়, কাল সকালে। আজ তোমরা একসঙ্গে ফিরে এসো।"

ওরা আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল।

রিমার বাবা ওদের ব্যাগগুলো সযত্নে রেখে দিলেন। বাবলু,বিলুর কোনও আপত্তিই শুনলেন না।

রিমাও বলল, "শুধু আজকের দিনটা, প্লিজ।"

স্টেশনের কাছ থেকেই বাস পেয়ে গেল ওরা। তারপর রঘুনাথপুরে এসে বাস থেকে যখন নামল তখন চারদিকের সুনসান ভাব দেখে অবাক হয়ে গেল।

দূরের একটা টিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিমা বলল, "ওই তোমাদের জয়চণ্ডী পাহাড়।"

বাবলু বলল, "একে ঘিরেই এত রহস্য!"

রিমা বলল, "শান্ত নির্জন এই পরিবেশে কোনও রহস্যই নেই। এ হল এক পবিত্র তপোভূমি। তবু তোমরা কেন যে এখানে ছুটে এলে তা বুঝতে পারছি না।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলি শোনো, নিখোঁজ হওয়া এক কিশোরের সন্ধানেই আমরা এখানে এসেছি।"

"বুঝলাম। এই ব্যাপারে আরও একটু পরিষ্কার করে বলায় তোমাদের কি কোনও আপত্তি আছে?"

বাবলু বলল, "না নেই। তুমি অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে। মনে হয় আমাদের কাজে তুমিও একটু-আধটু সাহায্য করতে পারবে। আমাদের উদ্দেশ্য তুমি যখন বুঝেই গেছ তখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলব তোমাকে।"

রিমা বলল, "তা হলে কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।"

ওরা যেখানে বাস থেকে নামল সেইখানেই একটা অস্থায়ী দোকানে বসে চা-বিস্কুট খেয়ে পাহাড়ের দিকে এগোল। একপাশে একটি বৃহৎ জলাশয়। অনেকটা দিঘির মতো। তারই পাড়ে একটি পাকুড়গাছের নীচে বসল ওরা।

বিলু বলল, "জায়গাটা খুব চেনা-চেনা লাগছে।"

বাবলু বলল, "লাগবারই কথা। কেননা একটি বিখ্যাত বাংলা ছবির শুটিং হয়েছিল এখানেই।"

দিঘির ঢালে কচি কচি ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আদুরে মেয়ের মতো পা দোলাতে দোলাতে রিমা বলল, "এবার বলো তো শুনি, তোমাদের ব্যাপারটা কী? এবং কেনই বা তোমরা এসেছ এখানে?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল রিমাকে।

শুনেই চমকে উঠল রিমা। বলল, "এত কাণ্ড এই পাহাড়টাকে ঘিরে! অথচ এত কাছে থেকেও কিছুই আমরা জানতে পারিনি।"

বাবলু বলল, "কাছে কোথায়? তুমি তো থাকো কলকাতায়। এখানকার ব্যাপারস্যাপার তুমি কী করে জানবে?"

রিমা বলল, "তোমরা কি জানো, একমাস আগেও আমি আমার হস্টেলের বান্ধবীদের নিয়ে এখানে এসে পিকনিক করে গেছি। শুধু তাই নয়, যে চন্দ্রকান্তগিরির নাম তোমরা করলে, উনি আমাদেরও গুরুদেব। তবে ওই গুরু-হনুমানের নাম আমরা শুনিনি কখনও। তিনি নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনও ব্যক্তি। ওঁর রহস্য এখনই উদ্ধার হবে।"

"কীভাবে?"

"এসো না!" বলেই বাবলুর একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকে।

বিলুও চলল সঙ্গে।

পাহাড়ের কোলে দেবীর মন্দির। কয়েকজন সেবক,পূজক ও তন্ত্রাভিলাষী সাধক রয়েছেন সেখানে। এঁরা সকলেই রিমার পরিচিত।

একজন সাধুবাবা বললেন, "কী রে বেটি, এই তো ঘুরে গেলি সেদিন। আবার এলি যে?"

রিমা তখন বাবলু আর বিলুকে দেখিয়ে বলল, "আসলে এই এদের জন্যই এলাম। আমাদের খুব পরিচিত। এরা দু'জনে আসছিল জয়চণ্ডী পাহাড়ে। পথঘাট চেনে না। আমি তাই সঙ্গে এলাম।"

"এসেছিস বেশ করেছিস। নে প্রসাদ খা।" বলেই হাঁক দিলেন, "সিধু, এদের একটু প্রসাদ দিয়ে যা না রে।"

প্রসাদ এলে প্রসাদ খেতে খেতে রিমা বলল, "শুনলুম এখানে নাকি ক'দিন আগে খুব কামেলা হয়ে গেছে।"

"আর বলিস না! আমরা সারাজীবন এখানে তপজপ সাধনভজন করে কাটিয়ে দিলাম, ইদানীং হয়েছে কীয়ত্তসব চোর-ছ্যাঁচোড়ের দল ভেকধারী হয়ে ভণ্ডামি করতে আসে। যে যেখানে পারে একটা করে ছাউনি নিয়ে বসে পড়ে আর চুড়ান্ত করে ভণ্ডামির। পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রকান্তবাবা একটা বেদি করিয়েছিলেন। পুরুলিয়ার আশ্রম থেকে এসে মাঝেমধ্যে তপজপ করতেন। শুদ্ধাচারে থাকতেন। অমন মানুষ আর হয় না। কিন্তু হলে কী হবে, উনি যত ভাল ওঁর চেলা দুটো তত বদ।"

রিমা বলল, "আপনি কাদের কথা বলছেন?"

"ওই যে কান্তিভাই আর শান্তিভাই। এই জয়চণ্ডী পাহাড়ে অশান্তির মূল কারণ ওরা দু'জনেই। ওরাই কোথা থেকে খুঁজেপেতে নিয়ে এসে এক জোচ্চোর ঠগকে বসাল এখানে। দু'হাতে নোট ছড়িয়ে শয়তানরা ভাবল আমাদের সকলকেই কিনে নেবে। কিন্তু তাই কি হয়?" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত 'সেভিং প্রাইভেট রায়ান' চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য।
২. বিশ্ববন্দিত ক্রিকেটার সার জন ব্র্যাডম্যানের।
৩. মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে।
৪. কল্যাণী ও বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে। গঙ্গা নদীর ওপর।
৫. কয়লাকে।
৬. ইউনিস বার্বার। আদতে আফ্রিকার বংশোদ্ভূত হলেও সিয়েরালিওন ছেড়ে এসে এখন ফ্রান্সের নাগরিক।
৭. স্বামী বিবেকানন্দ।

৮. লাল ক্রুসনার। তাঁর জন্ম নাটাল প্রদেশের জুলুল্যান্ডে বলে এ নামে তাঁকে ডাকা শুরু করেন ম্যালকম মার্শাল।
৯. দুঃখিত। বেড়াতে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ জায়গাটা চাঁদে।
১০. শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের।
১১. বেজিংয়ে বিখ্যাত তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের কাছে রেজ মিন হুইতাং বা ন্যাশনাল পিপল্‌স কংগ্রেস হল। আসনসংখ্যা ১০ হাজার।
১২. স্বামী সি জে হ্যান্টার, শটপাটে স্বর্ণজয়ী। স্ত্রী ম্যারিয়ন জোন্স স্বর্ণজয়ী ১০০ মিটার দৌড়ে।
১৩. এলমো লিঙ্কন। 'টারজান অব এপ্‌স' চলচ্চিত্রে।
১৪. অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'নকল সোনা' চলচ্চিত্রে। গানটি হল— 'একদিনেতেই হইনি আমি তোমাদের এই হেমন্ত'।
১৫. ইফতিকার আলি খান পটৌডি।

কুইজ

প্রশ্ন

১ মেঘালয়ের তুরা লোকসভা আসনের অন্তর্গত ১২টি পোলিং বুথকে এবার স্পর্শকাতর বলে ঘোষণা করা হয় এবং পশ্চিম গারো পার্বত্য জেলার বনদফতরকে বলা হয় ভোটার ও ভোটকর্মীদের সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে। এলাকাটি ডানেনগিরি বলে পরিচিত। কেন এই ঘোষণা এবং বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা?
জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, গল্‌ফ গ্রিন, কলকাতা।

২ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা বিশিষ্ট এক কৃষ্ণাঙ্গ নেতাকে সম্প্রতি কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী জে এইচ পটেল এক বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করেন। কী এই পুরস্কার? কাকে দেওয়া হচ্ছে? কী জন্য? কার নামে এই পুরস্কার?
পার্থজিৎ চক্রবর্তী, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।

৩ ভোটে হেরে গেলেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ও আইজাক নিউটন। জিতলেন কার্ল মার্ক্স। কিসের এই ভোটাভুটি?
সংযুক্তা ভট্টাচার্য, হরিদেবপুর, কলকাতা।

৪ অক্টোবরের গোড়ায় ঘোষিত হল ১৯৯৯-এর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। পেলেন বিশিষ্ট এক জার্মান ঔপন্যাসিক। আগামী ১০ ডিসেম্বর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে এই পুরস্কার, যার অর্থমূল্য ন'লক্ষ ৬০ হাজার ডলার। বছর ১২ আগে দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকতে এসেছিলেন কলকাতায়। কে ইনি?
আনন্দ রায়চৌধুরী, আমতা, হাওড়া।

৫ এক সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। বর্তমানে কুয়ালালামপুরের পেট্রোনাস টাওয়ার এই গৌরবের অধিকারী। এই বহুতল ভবনের উচ্চতা ৪৫২ মিটার বা ১,৪৮৩ ফুট। কিন্তু শিগ্‌গিরই এ গৌরবের অধিকারী হতে চলেছে আর-এক বহুতল, যার উচ্চতা হবে ৪৭২ মিটার বা ১,৫৫০ ফুট। কোথায়?
সুপ্রিয় চক্রবর্তী, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা।

৬ গিনেস বুকে আগের রেকর্ড ছিল ৫২ ঘণ্টার। অবিরাম মাউথ অর্গান বাজানোর। সম্প্রতি কেরলের কোচিতে শ্রোতাদের সামনে টানা ৬০ ঘণ্টা মাউথ অর্গান বাজিয়ে সে রেকর্ড ভেঙে দিলেন মলয়ালি এক পুরুষ। তিনদিন দু'রাত ধরে তিনি বাজিয়ে শোনান মলয়ালম, তামিল ও হিন্দি গানের অজস্র জনপ্রিয় সুর। কে ইনি? আগের রেকর্ডই বা কার ছিল?
চন্দন প্রামাণিক, বেনেপুকুর, কলকাতা।

৭ 'চলচ্চিত্ররত্ন' উপাধি পেলেন বিশিষ্ট এই সঙ্গীতশিল্পী। দিল কেরল ফিল্মস ক্রিটিক্‌স অ্যাসোসিয়েশন। কে এই জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক?
সায়ন সরকার, শ্রীরামপুর, হুগলি।

৮ সম্প্রতি দেশ জুড়ে যে লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল তাতে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে উঁচু পোলিং বুথটি ছিল ১২ হাজার ফুট উচ্চতায়। কোথায়?
প্রবুদ্ধ বসু, পাইকপাড়া, কলকাতা।

৯ পশ্চিমবঙ্গে সদর থেকে সবচেয়ে দূরতম পোলিং বুথটি ছিল কোথায়?
তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলেঘাটা, কলকাতা।

১০ পশ্চিমবঙ্গে কোন বুথে ভোটার সংখ্যা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম?
সেবন্তী চৌধুরী, যাদবপুর, কলকাতা।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

বিষয় : চিকিৎসা

প্রশ্ন

১ বিশ্বে প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করেন কে?
২ বিশ্বে আধুনিক শল্য চিকিৎসার জনক কাকে বলা হয়? তিনি কবে প্রথম এ পদ্ধতি চালু করেন?
৩ ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক হাসপাতাল কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
৪ প্রথম 'প্লাস্টিক সার্জারি' কোথায় হয়েছিল? কে এর জনক?
৫ দেহে রক্ত সঞ্চালনের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন?
৬ গুটি বসন্তের প্রতিরোধক টিকা দেওয়ার পদ্ধতি চালু করেন কে? কত সালে?
৭ মানবদেহে রক্তের কণিকার অনুপাত (শ্বেত ও লোহিত)

সম্পর্কে প্রথম সঠিক বিবরণ দেন কে?
৮ স্টেথোস্কোপের আবিষ্কারক কে?

৯ ইথারের সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র চিকিৎসা করেন কে? কত সালে?

১০ 'ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রে' বা 'এক্স রে' পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?

১১ ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় রেডিয়াম। তা কে আবিষ্কার করেন?

১২ রক্তের এ ও বি এবং এ বি গ্রুপ কে প্রথম আবিষ্কার করেন?

১৩ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় রোগীকে ইনসুলিন দেওয়া এখন খুবই চলতি ব্যাপার। অনেক রোগী নিজেই ইনসুলিন নেন। এই পদ্ধতি চালু করেন কে?

১৪ পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা কে?

১৫ হৃদ্‌যন্ত্রের গোলমালের চিকিৎসায় এখন রোগীর দেহে বসানো হয় পেসমেকার। এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন কে? কার শরীরে এটি প্রথম সংস্থাপন করা হয়?

১৬ বিশ্বে প্রথম হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিস্থাপন কোথায় হয়েছিল? কত সালে?
১৭ ভারতীয় কোন হৃদ্‌রোগীর প্রথম হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিস্থাপিত হয়? কত সালে?
১৮ ভারতে প্রথম সফল 'ওপেন হার্ট সার্জারি' হয় কোথায়? কবে?
১৯ ভারতে ১৯৯০ সালের ১০ অগস্ট মাত্র ন'দিনের এক শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি হয়। নেতৃত্বে ছিলেন চিকিৎসক ভি পি শেঠি। কোথায় হয়েছিল?
২০ আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত প্রথম ভারতীয় মহিলা ডাক্তার কে?

উত্তর

১. ইতালিতে খ্রিস্টান ধর্মগুরু সেন্ট বেসিল। ৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ২. অ্যামব্রোজ পেয়ারকে (Ambroise Pare)। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনিই প্রথম ক্ষতে গরম তেলের পরিবর্তে মলম এবং রক্ত বন্ধ করতে পটিবন্ধনী (ব্যান্ডেজ) ব্যবহার চালু করেন। ৩. মাদ্রাজে (এখন চেন্নাই) ফোর্ট সেন্ট জর্জে, ১৬৬৪ সালে। ৪. খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, ভারতবর্ষে। সুশ্রুত এই পদ্ধতিতে এক রোগীর দেহে কৃত্রিম নাসিকা স্থাপন করেন। তিনিই এ বিদ্যার জনক। ৫. ব্রিটিশ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে, ১৬২৮ সালে, 'অ্যান অ্যানাটমিক্যাল এক্সারসাইজ অন দ্য মোশন অব দ্য হার্ট অ্যান্ড ব্লাড ইন অ্যানিম্যাল্‌স' নামক পুস্তিকায়। ৬. ইংল্যান্ডের চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার। আট বছরের এক বালককে এই টিকা দেন তিনি ১৭৯৬ সালে। ৭. অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহোয়েক। ১৬৮৪ সালে। এর আগে ইনিই প্রথম লক্ষ করেন রোগজীবাণুর অস্তিত্ব। ৮. নলযুক্ত এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন ফরাসি চিকিৎসক রেন লেনেক, ১৮১৯ সালে। ৯. ১৮৪২ সালে জর্জিয়া, জেফারসনের চিকিৎসক ক্রফোর্ড লং। ১০. জার্মানির উয়েরৎসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলহেল্‌ম রোয়েন্টজেন ১৮৯৫ সালে। ১১. পিয়ের ও মেরি কুরি, ১৮৯৮ সালে। ১২. অস্ট্রিয়ায় জন্মানো মার্কিন প্যাথোলজিস্ট কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার, ১৯০১ সালে। পরে ১৯২৭ সালে আবিষ্কৃত হয় এম এবং এন গ্রুপ। ১৩. কানাডার সার ফ্রেডারিক বান্টিং ও চার্ল্‌স বেস্ট, ১৯২১ সালে। ১৪. স্কটল্যান্ডের ব্যাকটেরিওলজিস্ট আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে যুগান্তকারী এই অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। ১৯৪৫ সালে এ জন্য তাঁর দুই সহযোগী হাওয়ার্ড ফ্লোরে ও আর্নেস্ট চেনের সঙ্গে ফ্লেমিংকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৫. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ পল জোল, ১৯৫২ সালে। এটি প্রথম স্থাপন করা হয় হৃদ্‌রোগী ডেভিড স্লোয়াৎর্সের শরীরে, বাইরে রেখেই। পরে ১৯৫৮ সালে স্টকহমের আর্ন লার্সনের দেহের ভেতরে প্রথম পেসমেকার বসানো হয়। এই কাজ করেন এক সেনিং। ১৬. ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাঃ ক্রিশ্চান বার্নার্ড এই যুগান্তকারী শল্য চিকিৎসা করেন লুই ওয়াশকানস্কির হৃদ্‌যন্ত্রে। রোগী ১৮ দিন পরে মারা যান। ১৭. এ মাধব রাওয়ের, ১৯৮৫ সালের ২৯ মে। এ চিকিৎসা অবশ্য হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায়। তখন ব্যয় হয়েছিল ভারতীয় অর্থমূল্যে ১২ লক্ষ টাকা। এ অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘদিন সুস্থ ছিলেন রোগী। ১৮. ভেলোরে ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, ১৯৫৯ সালের ৬ জুলাই। রোগী ছিল ১২ বছরের ছেলে বেলুয়া (পরবর্তীকালে বেলুয়া স্যামুয়েল)। চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ এন গোপীনাথ ও ডাঃ আর এইচ বেট্‌স। ১৯. কলকাতার বি এম বিড়লা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। ২০. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮৭ সালে। তিনি তৎকালীন ইডেন হাসপাতালে যোগ দেন।

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের কারমাকের অগ্ন্যুৎপাত

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল

গল্প : গোসিনি
ছবি : উডেরজো

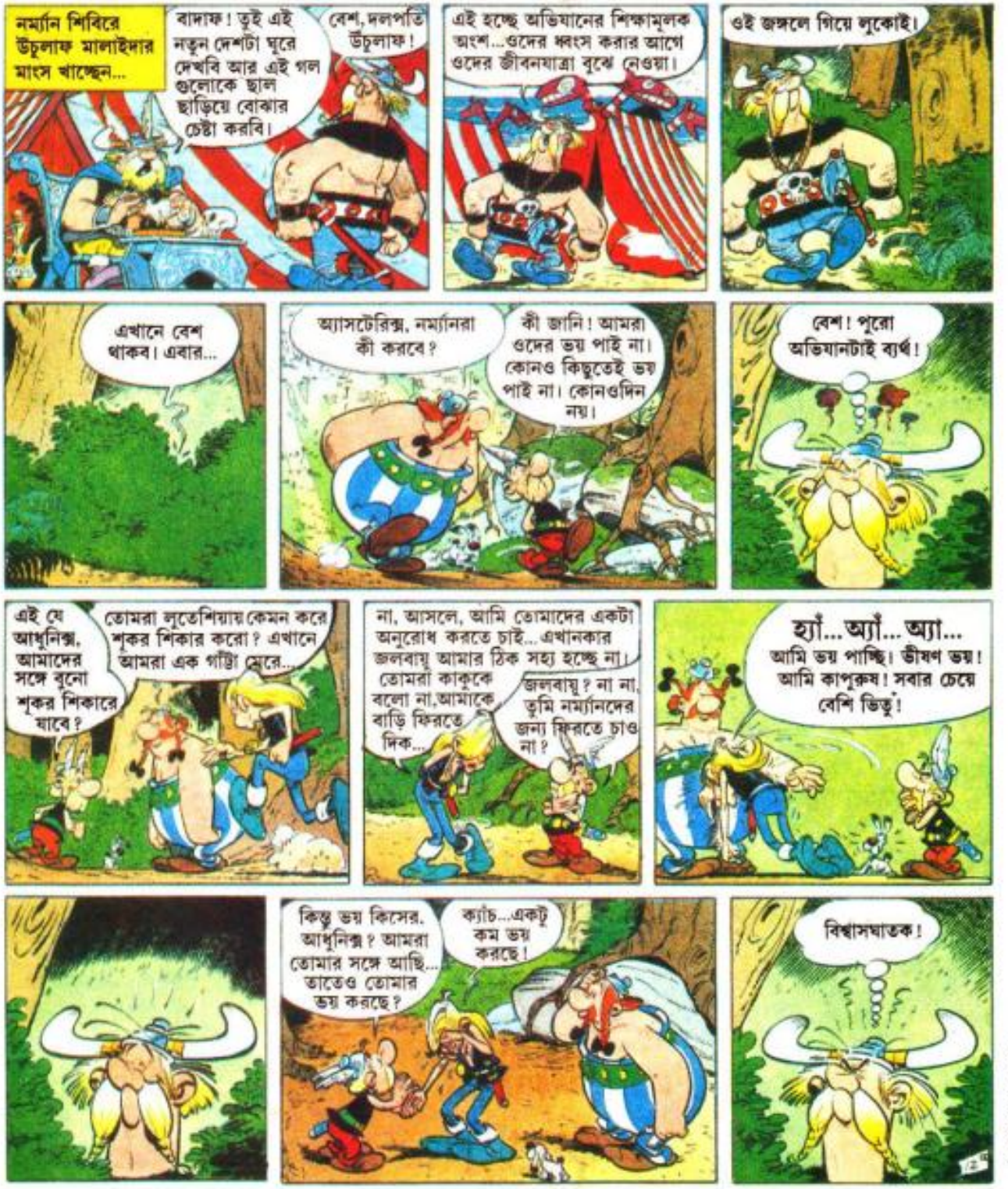

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কাকে বলে প্ল্যান, কাকে বলে এলিভেশন

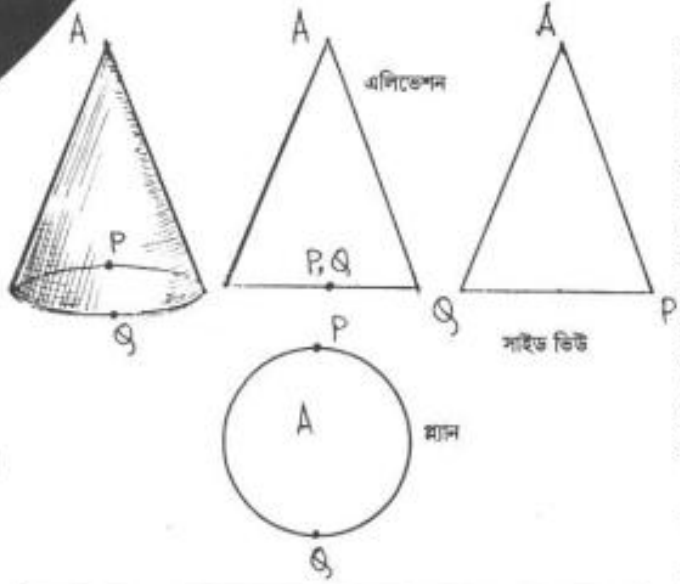

তোমাদের সবাইকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করা যাক নতুন একটা বিষয় নিয়ে সামান্য আলোচনা।

তোমরা তো জানো, বাড়ি তৈরি করতে গেলে 'প্ল্যান' করতে হয়। একই সঙ্গে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সামনে থেকে বাড়িটাকে দেখতে কেমন হবে, সেই ছবিও এঁকে দেন স্থপতি। এই ছবিকে বলে 'ফ্রন্ট এলিভেশন'। সহজভাবে বলতে গেলে, কোনও জিনিসকে আমরা যদি অনুভূমিকভাবে তাকিয়ে দেখি, তা হলে যা দেখতে পাই তাকে বলে সেই জিনিসের 'এলিভেশন'। আর, ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে জিনিসটিকে যেমন দেখায় তাকে বলে 'প্ল্যান'। এঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়ে তাদের 'এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং' নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। তখন এলিভেশন, প্ল্যান ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাতে হয়।

এলিভেশন, প্ল্যান যখন বুঝে গেলে তখন নিশ্চয়ই তোমরা বলতে পারবে কাকে বলে 'এন্ড ভিউ' বা 'সাইড ভিউ'। নামটা শুনে ব্যাপারটা আন্দাজ করা মোটেই কঠিন নয়। কোনও জিনিসকে ডান দিক বা বাঁ দিক থেকে অনুভূমিক ভাবে দেখলে যেমন দেখায়, তাকেই বলে সেই জিনিসের সাইড ভিউ। আর, জিনিসটিকে তার সঠিক ত্রিমাত্রিক চেহারায় যদি আঁকা হয় তবে সেই ছবিকে বলে 'আইসোমেট্রিক ভিউ', কিংবা সংক্ষেপে আইসোমেট্রিক। নীচে একটি শঙ্কুর এলিভেশন, প্ল্যান ও সাইড ভিউ দেখানো হল।

আইসোমেট্রিক ভিউ-তে Q বিন্দু আছে আমাদের সামনে, আর P বিন্দু আছে পেছনে— চোখের আড়ালে। সুতরাং পেছনের P বিন্দু ও বক্ররেখা আইসোমেট্রিকে দেখা যাবে না। বোঝার সুবিধের জন্য আমি ওগুলো স্পষ্ট করে এঁকে দেখিয়েছি। এর পর শঙ্কুটির এলিভেশন, প্ল্যান ও সাইড ভিউ-তে A, P ও Q বিন্দুর অবস্থান লক্ষ করলেই বোঝা যাবে ড্রইংগুলো কী কী নিয়ম মেনে আঁকা হয়েছে।

এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর নেমে পড়া যাক ধাঁধার আসরে। এবারের প্রথম ধাঁধা এলিভেশন আর প্ল্যান নিয়েই।

□ এলিভেশন ও প্ল্যানের সমস্যা

নীচে একটি বস্তুর এলিভেশন ও প্ল্যান দেওয়া হল। ভেবে বলতে পারো, বস্তুটির সাইড ভিউ কেমন হবে, আর তার আইসোমেট্রিক ভিউই বা কেমন! এই সমস্যাটি পাঠিয়েছে ধ্রুবজ্যোতি সাহা (পানিহাটি, উত্তর 24 পরগনা)।

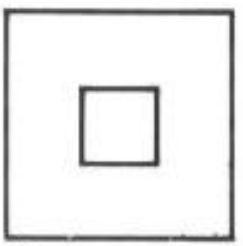
এলিভেশন

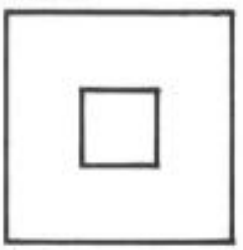
প্ল্যান

□ আত্মপ্রেমী সংখ্যার সমস্যা

এই ধাঁধাটি পাঠিয়েছে অধিজিৎ চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা-38)। ও লিখেছে :

গ্রিক পুরাণের নার্সিসাস জলে নিজের অপরূপ মুখের প্রতিবিম্ব দেখে তাকে ভালবেসেছিলেন। সেই ভালবাসার টানে তিনি দিনের পর দিন একই ভাবে সেখানে বসে থাকেন। ফলে অনাহারে তাঁর মৃত্যু হয়। তাই নার্সিসাস শব্দের আর এক অর্থ আত্মপ্রেমী। এই গল্প মনে রেখে এক বিশেষ ধরনের সংখ্যার নাম দেওয়া হয়েছে আত্মপ্রেমী সংখ্যা। এই ধরনের সংখ্যার অঙ্কগুলোর ওপরে বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সেই সংখ্যাটিকেই পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসন রামানুজনের গণিত-প্রতিভার 'আবিষ্কারক' গণিতজ্ঞ গডফ্রে হ্যারল্ড হার্ডি চারটি আত্মপ্রেমী সংখ্যার উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলো হল :

$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$, $370 = 3^3 + 7^3 + 0^3$

$371 = 3^3 + 7^3 + 1^3$ এবং $407 = 4^3 + 0^3 + 7^3$

এরকম আরও কয়েকটি আত্মপ্রেমী সংখ্যা হল 1233, 8833, 63 এবং 221859, তোমরা প্রমাণ করে দেখাতে পারো, কেন এরা আত্মপ্রেমী সংখ্যা!

25 অগস্ট সংখ্যার উত্তর

□ ছাপার ভুল

সংখ্যা চারটি হল 2, 5, 9 এবং 2, কারণ, $2^5 \times 9^2 = 2592$; এই চারটি সংখ্যা দিয়েই এই সমস্যার এক ও একমাত্র সমাধান পাওয়া যায়।

□ চার অঙ্কের সংখ্যার সমস্যা

চার অঙ্কের দুটি সংখ্যা সমস্যার শর্ত পূরণ করে : 2025 আর 9801। কারণ,

$2025 = (20+25)^2$

এবং $9801 = (98+01)^2$

□ বর্ণের অদ্ভুত শ্রেণী

সঠিক উত্তর হল R, কারণ, লক্ষ করলেই দেখতে পাবে, শ্রেণীর প্রতিটি বর্ণ কিছুটা করে

ওলটপালট

নীচে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই খুঁজে পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি।

মালটালটা

গুমাকাটিরী

ঘটিহাতয়দ

বুলিলাকাওয়া

কথামৃত পাঠ
প্রোমোটারের শিক্ষালাভ

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান :
পাদুকালয়ের মালিকের চিঠিতে সম্বোধন।

এবার পাশের গোল-চিহ্নের ভেতরের অক্ষরগুলোকে উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে ওপরের কার্টুন ছবির সঙ্কেতের সমাধান

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ : সুপরিচিত, অবিচলিত, জীবনেমরণে, পরশ্রীকাতর।

ঘোষক

জায়গা ঘিরে রেখেছে। নীচের ছবি দেখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

A B D ●
P Q R

সঠিক উত্তর যারা দিয়েছে

আমাদের দুর্ঘটনা বিপর্যস্ত দফতরে উত্তরদাতাদের মাত্র দুটি চিঠি উদ্ধার করা গেছে। উত্তরদাতাদের নাম ধ্রুবজ্যোতি সাহা (পানিহাটি, উত্তর 24 পরগনা) ও সুরম্য চক্রবর্তী (মালঞ্চ-মাইনগর, দক্ষিণ 24 পরগনা)। 'বর্গের অদ্ভুত শ্রেণী' সমস্যার সঠিক উত্তর ধ্রুবজ্যোতি দিতে পারেনি, অন্য দুটি পেরেছে। কিন্তু সুরম্য তিনটি ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিয়েছে। তাই এবারের সেরা সুরম্য।

এই সংখ্যার সেরা উত্তরদাতা
সুরম্য চক্রবর্তী
মালঞ্চ-মাইনগর, দক্ষিণ 24 পরগনা

অনীশ দেব

শব্দসন্ধান

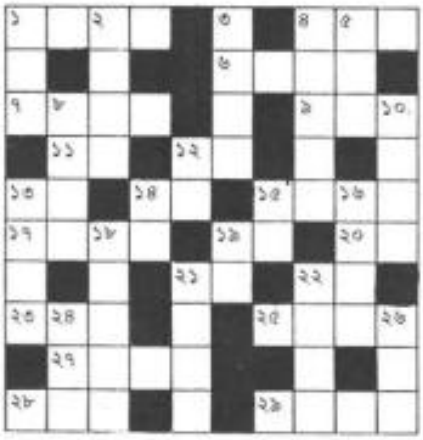

সংকেত : পাশাপাশি

(১) শকুন্তলার পালক পিতা। (৪) নীচের ঠোঁট। (৬) অন্য জন্ম। (৭) গরমকালে উপাদেয়। (৯) গুরুজনের সামনে যা হওয়া উচিত। (১১) '—সে চাহে ধুপেরে রহিতে জুড়ে।' (১২) বর্ষায় এদের কোলাহল। (১৩) আভাস, ইঙ্গিত। (১৪) জয়ের হলে গলায় পরে আনন্দ হয়। (১৫) সুন্দরবনের বনদেবী। (১৭) লেখা কেটে শুধরে দেওয়া। (১৯) অর্ধেক। (২০) পৃথিবীর তিনভাগ জুড়ে আছে। (২১) যা-থেকে আটা হয়। (২২) 'দূরের খেয়ায় দেব—।' (২৩) তাঁবুর ঘের বা পরদা। (২৫) বনস্থলী। (২৭) চালভাজা খেতে দিলে—হাসি। (২৮) শিষ্টাচার, ভদ্রতা। (২৯) বাহবা, শাবাশ।

উপর-নীচ

(১) পাঁশুটে রং, মেটে রং। (২) গ্রন্থের গোড়ায় যা পাঠের আগ্রহ বাড়াবার জন্য লেখা হয়। (৩) জাঁকজমকপূর্ণ। (৪) যার শেষ নেই। (৫) রকম, প্রকার। (৮) বদমেজাজি। (১০) যা শূন্য করে খাজাঞ্চি পলাতক। (১২) এটি কলার হলে সাগর পার অসম্ভব। (১৩) পাহাড়ের পথ যেরকম। (১৪) প্রবল বৃষ্টিতে খেলা যা হয়। (১৫) হত্যা। (১৬) দুর্ভাগ্যজালে— জীবন। (১৮) প্রতারকের মনে যা থাকে। (১৯) যা ফুরালে আমসি। (২১) রাজহস্তী। (২২) চিনির রসে ডোবানো ছানার ভাজা মিষ্টি। (২৪) অবধি, পর্যন্ত। (২৬) অন্যায় কর্মে যা হতে হয়।

গত সংখ্যার সমাধান

র	ঘু	না	থ	■	বি	দ্যা	সা	গ	র
ন	■	ম	র	ক	ত	■	র	■	ট
পা	ই	ক	■	■	র	■	মে	ঘ	না
■	ত	■	কি	র	ণ	ম	য়	■	■
ম	স্ত	■	শ	■	■	রু	■	কা	রা
ন	ত	■	মি	■	■	দ্যা	■	না	গ
■	■	কু	শ	ল	দা	ন	■	ক	■
সু	ম	ন্দ	■	শ্ক	■	■	জ	ড়ি	ত
স্বা	■	দ	■	প	রি	জ	ন	■	প
দু	র	ন্ত	গ	তি	■	লো	ক	সা	ন

দেবসেনাপতি

অরণ্যদেব
মাছ পাঠাচ্ছে না কেন মোরিরা...তা নিয়ে ক্ষুব্ধ অরণ্যবাসীরা...
মাছ কোথায়?
স্বর্গোদ্যানে মাছ খেতে পাচ্ছে না বাঘ-সিংহ... দেখছে তা গ্লাদ...
তিন বার
তিন বার
উদ্বিগ্ন খুদে মানবদের রাজা পাঠাচ্ছে বেতার সঙ্কেত...
ক্রি-রিং
রিং-রিং
স্বর্গোদ্যান থেকে বার্তা!
ক্রি-রিং
রিং-রিং
ক্রি-রিং
রিং-রিং
জরুরি বার্তা গ্লাদের। হিরো, মোটর সাইকেলেই যাই বরং, তুই থাক।
9-28
গুরুতর কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে স্বর্গোদ্যানে! কী ব্যাপার?
মাছ নেই, বাঘ-সিংহ খেতে পাচ্ছে না স্বর্গোদ্যানে...
গ-র-র-র-র-র
মাছ না পেয়ে ক্ষিপ্ত বাঘ-সিংহেরা। আক্রমণ করছে বন্ধু ডলফিনদের...
ক্রমশ

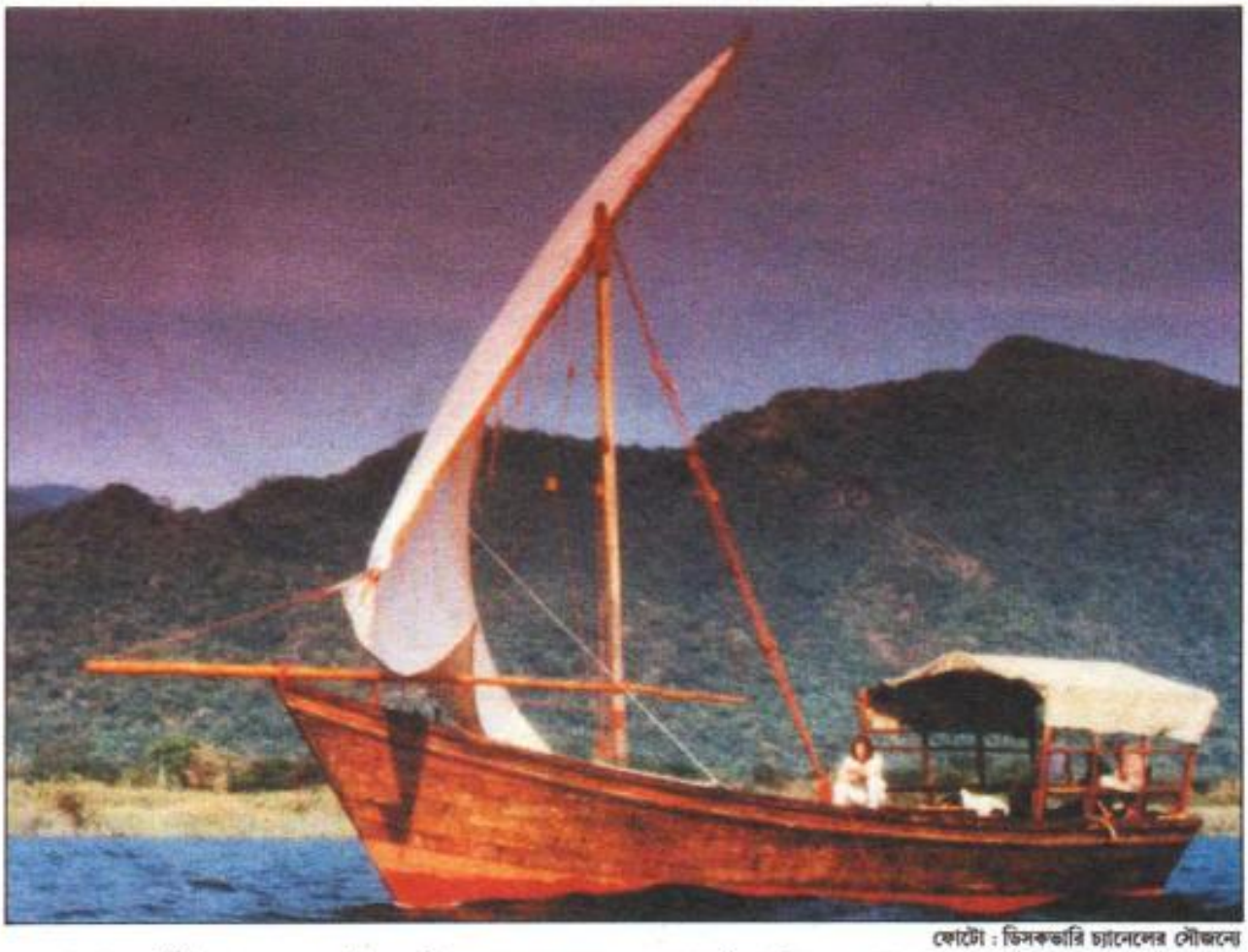

ফোটো : ডিসকভারি চ্যানেলের সৌজন্যে

অজানা আফ্রিকা

আফ্রিকা মহাদেশের গহন অরণ্যের মতো তার ধু-ধু দিগন্তে বিলীন মরুভূমিও মানুষের মনে দারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি করে এসেছে। আসলে আফ্রিকা মহাদেশটা এমন রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা বলেই বহু মানুষের কাছে তার আলাদা গুরুত্ব।

'আনচার্টেড আফ্রিকা'র এই পর্বে র‍্যাল্‌ফ বসফিল্ড এবার ব্যাখ্যা করেছেন আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমির সংরক্ষণ নিয়ে। বসফিল্ডের সাফারি ক্যাম্পে তাঁর সহকর্মী সুপার স্যানডের সঙ্গে সঙ্গে এই মরুপ্রেমিক বন্যজীবন, প্রত্নপ্রাণিতত্ত্ব এবং বন্যশেল নিয়ে নানা তথ্য দর্শকদের জানিয়েছেন। তিনি তাঁর জঙ্গলসঙ্গীর সঙ্গে আফ্রিকার দক্ষিণাংশ সফরের সময় যেসব উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেসব রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা জানিয়েছেন এই পর্বে। আফ্রিকা মহাদেশের কালাহারি মরুভূমি নিয়ে যাঁদের তেমন ধারণা নেই, তাঁদের যথেষ্টই রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ আছে। ডিসকভারি চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি দেখানো হয়েছে ১৩ অক্টোবর।

লন্ডনের ভূগর্ভপথ: দ্য ট্রেন ইন দ্য ড্রেন

এই শহরের সাবওয়ের সঙ্গে আমাদের প্রায় সকলেরই মোটামুটি পরিচিতি আছে। কাজে বেরোলে কিংবা ট্রেন ধরতে গেলে পার্ক স্ট্রিট বা হাওড়া স্টেশনে আমরা প্রায়ই সাবওয়ে ব্যবহার করে থাকি। বিদেশে এমন সাবওয়ে আছে এক নয়, অজস্র। ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনেও এইরকম সাবওয়ের সংখ্যা একাধিক। এমনিতে ওই শহরের রাজপথ দিয়ে হেঁটে গেলে বোঝাই যাবে না, ওইসব ঐতিহাসিক রাস্তার ঠিক ৬০ ফুট নীচে কী ধরনের আশ্চর্য কর্মকাণ্ড চলছে। মাটির ৬০ ফুট নীচে হাজার বিশেক মানুষ ইউরোপের সবচেয়ে বৃহত্তম কারিগরি প্রকল্পের কাজ জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছে, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এটিই হবে একুশ শতকের প্রথম সাবওয়ে যোগাযোগ, যা লন্ডন টিউব রেলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবে। গত ছ'বছর ধরে প্রযুক্তিবিদেরা 'টানেল' খুঁড়ে 'বিল্ডিং স্টেশন' তৈরি করে চলেছেন, তৈরি করছেন দীর্ঘ 'ট্র্যাক'। এই চারশো কোটি ডলারের প্রকল্প রূপান্তরিত করতে গিয়ে অনেক প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়তে হচ্ছে কর্মীদের। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো দীর্ঘ সাবওয়ে নানা বাধাবিপত্তি জয় করে সমাপ্তির দিকে এগোলেও লন্ডনবাসীদের মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার পুরনো পরিচিতি। এখনও খানিকটা স্নেহের সুরে এই সাবওয়েকে ডাকা হয় 'দ্য ট্রেন ইন দ্য ড্রেন' বলে। ১২ অক্টোবর ডিসকভারি চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে জানা গেল পৃথিবীর প্রাচীনতম সাবওয়ের ইতিহাস।

মণিশঙ্কর দেবনাথ

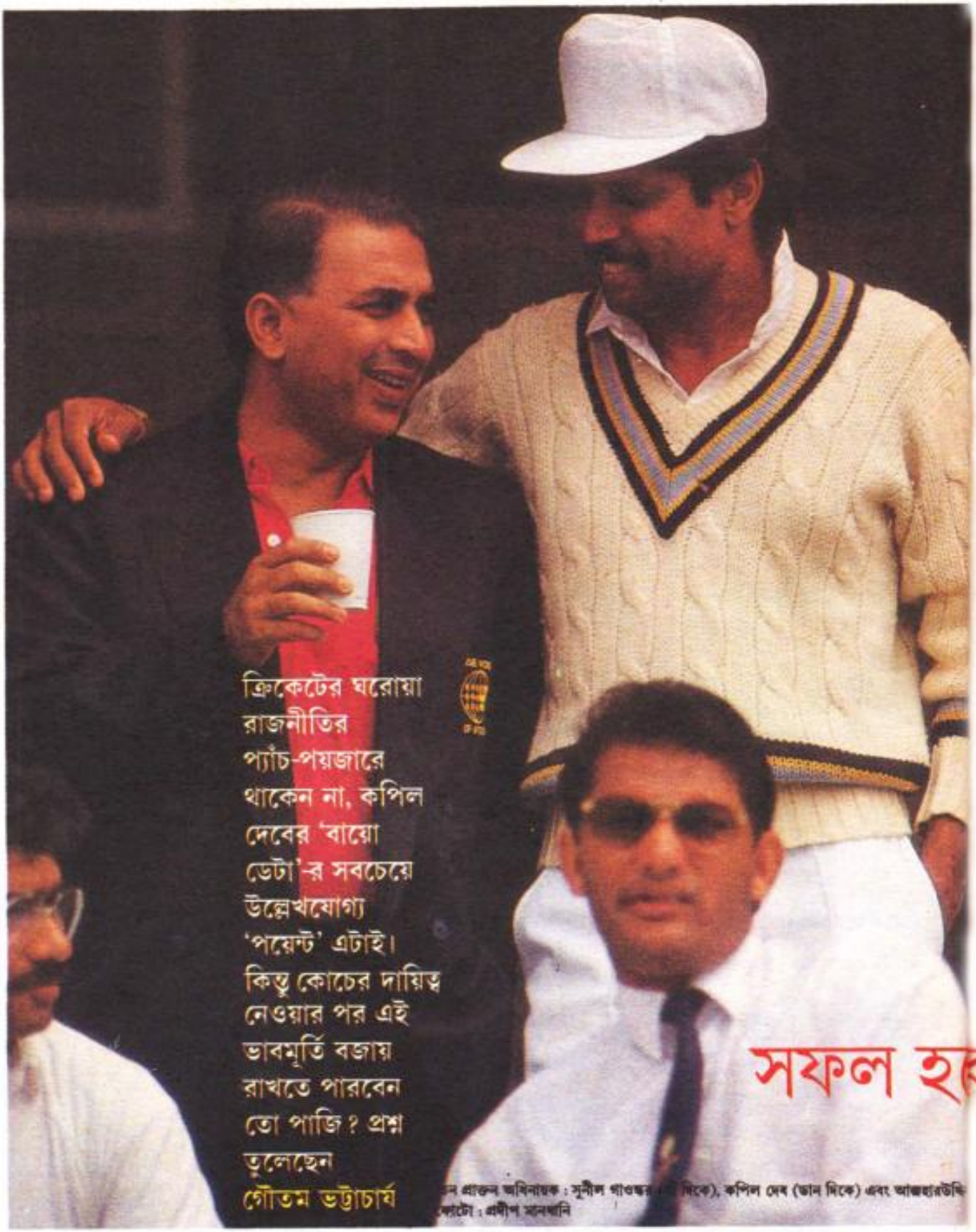

সফল হবে

ক্রিকেটের ঘরোয়া রাজনীতির প্যাঁচ-পয়জারে থাকেন না, কপিল দেবের 'বায়ো ডেটা'-র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'পয়েন্ট' এটাই। কিন্তু কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পারবেন তো পাজি? প্রশ্ন তুলেছেন গৌতম ভট্টাচার্য

ন প্রাক্তন অধিনায়ক : সুনীল গাওস্কর (দিকে), কপিল দেব (ডান দিকে) এবং আজহারউদ্দি
ফোটো : প্রদীপ মানধানি

তাজ গ্যালেস হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট রুমে ঢোকার মুখে দেখলাম হালকা ভিড়। প্রথমেই চোখে পড়ল সচিন তেন্ডুলকরের মলিন, ক্লিষ্ট মুখটা। একটা গাঢ় নীল টি-শার্ট পরেছেন সচিন। কিন্তু মুখটা এমন, যেন কেউ ব্লটিং পেপার দিয়ে সব রংটং শুষে নিয়েছে। পাশে ম্লানমুখে ভারতের আরও ক'জন।

সেই প্রথম সন্দেহ হল—কী হচ্ছে এখানে? কপিল দেবই বা হাসতে হাসতে কী সব বলে যাচ্ছেন এমন গোমড়া মুখের সমাবেশকে।

আগের ঘটনা এরকম : চুরানব্বইয়ের অক্টোবর। উইলস্ ওয়ার্ল্ড সিরিজের ম্যাচ হচ্ছে দিল্লিতে। কপিল দেবের কোম্পানি দেব ফিচার্স থেকে আমরা ম্যাচের আগের দিন কয়েক লাইনের চিঠি পেয়েছি। তাতে বলা আছে দেব ফিচার্সের পক্ষে আপনাদের আগামীকাল টি-পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। কারণটারন কিছু বলা নেই। আগামীকাল মানে কালীপুজোর দিন। সেদিন কাগজ বন্ধ। প্রেস কনফারেন্স যা-ই হোক না কেন, পরের দিন আনন্দবাজার বেরোচ্ছে না। অতএব টি-পার্টিতে যাব কী যাব না সেটা ভাবতেই প্রচুর সময় চলে গেল। দেব ফিচার্সের মামুলি পি আর এক্সারসাইজে যাওয়ার মানে হয় না এরকম মতামতও শুনলাম কিছু সাংবাদিকের কাছে। সময় নষ্ট করতে যাচ্ছি ধরে নিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত ঢুকেছি, আধ ঘন্টা লেট।

এর পর এই দেখছি এবং শুনছি। কিছু মানেই বুঝতে পারছি না। কপিল দেব বলছেন, "আমার মা'র কথাটা মাথায় রেখেছিলাম। মা বলতেন, 'কুছু যব ভি ছোড় না, হাসকে ছোড় না। যখনই খেলা ছাড়বি, হাসতে হাসতে ছাড়বি। আজ সেই দিন।" বলতে বলতে একচোট হাসলেনও। বাকিরা প্রায় নির্বাক, নিশ্চুপ। সেদিকে তাকিয়ে কপিল আবার হাসছেন। "আরে, এত মুখ গোমড়া করে আছেন কেন? একদিন না একদিন তো শেষ হতই।" যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। চা সবার হাতে ঠিকঠাক পৌঁছছে কি না, দেখার ফাঁকে রোমি দেবও বললেন, "ছাড়তে তো হতই। আজ না হোক কাল।"

ষোলো বছরের সাংবাদিক জীবনে এত লোককে অবসর নিতে দেখলাম। কপিল দেবের মতো এমন চমক দিয়ে এবং এমন হাসতে হাসতে সরে যেতে আর কাউকে দেখিনি। আগের দিন যে সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে ঘুরেছে সে-ও হদিস পায়নি। মানুষটা পরের দিন অবসর নিচ্ছে।

এ বারও তাই! চুরানব্বইয়ের অক্টোবরে সরে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আর

হবেন, তার পর?

নিরানব্বইয়ের সেপ্টেম্বরে কোচ হয়ে ফিরলেন। দু'বারই ঘুণাক্ষরে কাউকে টের পেতে দেননি।

কলকাতার কিছু পাড়ায় দেখা গেল, সৌরভ, সচীন বা জাডেজার নয়, কপিলের পোস্টার আটকানো হয়েছে বড় করে। শুনলাম কোনও কোনও বাঙ্কে মিষ্টি আনিয়ে সেলিব্রেট করেছেন কর্মীরা। খবরের কাগজের অফিসে মুহুর্মুহু ফোন, "কপিলের ইন্টারভিউ বেরোচ্ছে তো কাল?" শহরের কোথাও যদি পটকাও ফেটে থাকে, অবাক হওয়ার নেই। শহরটাই বা কেন বললাম। 'আনন্দমেলা'র পাঠকরা ভারতের যে যেখানে ছড়িয়ে আছেন সর্বত্র নিশ্চয়ই একই রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছেন। আমার ধারণা, সুনীল গাওস্কর ভারতীয় কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে রাজি হলেও এমন সর্বগ্রাসী আর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হত না। কপিল দেব-প্রেমী আমার এক কানপুরের বন্ধু আছে। তার সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হয়। কিন্তু সময়-সময় গাওস্কর আর কপিলের তফাত নিয়ে ও যে কথাটা বলে তা উড়িয়ে দিতে পারি না, "গাওস্করকে আসমুদ্র হিমাচল শ্রদ্ধা করে। আর কপিলকে ভালবাসে।"

একমাত্র সমস্যা শুধুই প্রাক্তন হিসেবে থেকে যেতে চাইলে এই ভালবাসার পাহাড়ের দেহ কপিল দেবের চলে যেত। যেমন চলে গিয়েছে গত চারটে বছর। কিন্তু কপিল যে এখন 'পারফর্মিং প্রাক্তন'-এর খাতে নিজেকে

অন্য ভূমিকায়

ষোলো বছরের সাংবাদিক জীবনে এত লোককে অবসর নিতে দেখলাম। কপিল দেবের মতো এমন চমক দিয়ে এবং এমন হাসতে হাসতে সরে যেতে আর কাউকে দেখিনি।

কপিলের কোচ দেশপ্রেম আজাদ

বইয়েছেন। সেখানে সেই সুদে হবে না, নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হচ্ছে তাঁকে—ব্যর্থতা মানে ওভারড্রাফ্ট আর সাফল্য মানে ডিপোজিট। কপিলের নিজের জীবনের বৃহত্তর সময়ে এত বেশি ক্রিকেট হত না। এখন ভারতের জাতীয় ক্রিকেটার হওয়া মানে প্রতি সপ্তাহে ম্যাচ। কপিলের যুগে মার্চ মাসে দুর্দান্ত পারফর্ম করে অন্তত মে পর্যন্ত সেই গৌরবের ছায়ায় রিলাক্স করার সুযোগ ছিল। এখন নেই। স্কুলের মতো প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা এখন। একই মাসের ভেতর কেউ হিরো থেকে জিরো হয়ে যেতে পারে। ট্রাপিজের দড়ির মতোই একচুল এদিক-ওদিকে বদলে যায় ক্রিকেটারের ভাগ্য। এখন তারাও যেন এক-একজন ফিল্ম-তারকা। প্রতি শুক্রবার তার নতুন নতুন বক্স অফিস। মাসের সাত তারিখে লোকে হয়তো তাকে বলছে, "চলে না, চলে না," আবার একত্রিশতম দিনে বলছে, "ওয়ার্ল্ডস বেস্ট।"

ক্রিকেটারের গড়পড়তা বয়েস কমতে-কমতে যেখানে পৌঁছচ্ছে তাতে এই বয়সীরা ভাগ্যের এমন সি-সর সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়বে এটাই স্বাভাবিক। আর সেজন্যই অসীম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে তাদের পরিচালকের ভূমিকা। অনভিজ্ঞতাজনিত, জীবন সম্পর্কে তাদের মানসিক ঘাটতি যে পরিচালক পূরণ করে দেবেন এটা অধুনা দল পরিচালনার অপরিহার্য শর্ত।

দুই, আধুনিক ক্রিকেট যেখানে পৌঁছেছে, তাতে একা অমিত দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে যুদ্ধ জেতার উপায় নেই। বিপক্ষ যেখানে প্রযুক্তির সবরকম সাহায্য নিচ্ছে, মেডিক্যাল সায়েন্সের সর্বশেষ অগ্রগমন কাজে লাগাচ্ছে, সেখানে ধারাবাহিক সাফল্য পেতে হলে কোচকেও ক্রিকেটের বাইরে বেরোতে হবে। একটা কপিল দেব টিমে থাকাটা আর যথেষ্ট নয়, সমান জরুরি হল কোচের চেয়ারে একজন বব উলমার থাকা।

এখন ভারতের জাতীয় ক্রিকেটার হওয়া মানে প্রতি সপ্তাহে ম্যাচ। কপিলের যুগে মার্চ মাসে দুর্দান্ত পারফর্ম করে অন্তত মে পর্যন্ত সেই গৌরবের ছায়ায় রিলাক্স করার সুযোগ ছিল। এখন নেই। স্কুলের মতো প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা এখন।

হাতে ব্যাটের বদলে র‍্যাকেট

সুইমিং পুলে

আর এই স্টেশনে পৌঁছেই সংশয়টা— কপিল দেব কপিল দেব হতে পেরেছেন কিন্তু বব উলমার হতে পারবেন? সফলতম মজদুর থেকে সফল মিল মালিক— এই উত্তরণ পারবেন তো ঘটাতে?

প্ল্যানিং বা দলগত প্রস্তুতি সম্পর্কে তাঁর অনীহার কথা সর্বজনবিদিত। তিনি বলেন গ্যারি সোবার্সপন্থী। মাঠে নামো, পারফর্ম করো, দলকে জেতাও। অশোক মাঁকড় বা মুম্বইওয়ালারা ঠিক উলটো। তাঁরা ভাবেন আগে, করেন পরে। চুরাশির পাকিস্তান সিরিজে খুব সম্ভবত শেষ ম্যাচে ম্যানেজার হয়ে মাঁকড় বসতে চাইলেন কপিলের সঙ্গে। ম্যাচ শুরুর আগের দিন তাঁকে বললেন, "কপিল, তোমার সঙ্গে একটু স্ট্র্যাটেজিগত আলোচনা আছে। তৃতীয় দিন মনে করা যাক আমরা খারাপ হতে থাকা উইকেটের সঙ্গে মানাতে পারছি না। তখন কী করা? চলো, ভাবা যাক।"

"কাকা, তুমি পারোও, এখনও খেলাই শুরু হল না,. তুমি ভাবছ, থার্ড ডে-র কথা, চলো কাল দেখা যাবে," মাঁকড়ের কথামতো এভাবে হাসতে হাসতেই কপিল ম্যানেজারের ঘর ছেড়ে চলে যান।

কপিল সম্পর্কে আরও একটা সমালোচনা হল, তিনি কখনও সঙ্গী পেসারদের কিছু শেখাননি। তাঁর ক্রিকেট বরাবরই দলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেওয়ায় সীমায়িত। বাকি বোলারদের সেরাটা বার করে করে আনায় নয়। অতুল ওয়াসন, বিবেক রাজদান বা শ্রীনাথদের কখনও নাকি তিনি বলেননি, চলো, অমুকটা করো, উপকার পাবে। বা ইমরানের মতো তাদের পিঠে স্নেহের হাত রাখেননি। উগবগানি তৈরি করে দেননি ভেতরে।

সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বলছিলেন, কোচ কপিলের সাফল্য সম্পর্কে তিনি খুবই সন্দিহান। হর্ষ ভোগলে বলছিল, জাডেজার প্রতি কপিলের অসম্ভব অপত্য স্নেহ কোচ হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে কি না ও বুঝে উঠতে পারছে না।

এগুলো খুব মেপেজুকে বলা। খুব সহজ কথা হল, কপিলকে ঘিরে গণআশার জোয়ারের পিঠোপিঠি একটা অদৃশ্য ভাটার টান আছে। একটা বিরাট অংশ যেমন অন্যায় আবদার করছে যে এই কপিল দেব হাজির হচ্ছেন কুইক ফিক্স আঠা নিয়ে, যে-কোনও ভেঙে যাওয়া সমস্যার মাঝখানে তিনি সেই আঠা লাগিয়ে দেবেন তেমনই একটা ছোট অংশও সমান্তরালভাবে ওত পেতে থাকা।

কেন? মাসছয়েক পরে এই কথাটা বলার জন্য, "কী বলেছিলাম, মিয়াঁদাদের দশা হবে? পালাতে কুল পাবে না।"

ব্যক্তিগতভাবে আমারও মনে হয়, ক্রিকেটজীবনের চেয়ে কপিলের এই পরীক্ষা কঠিনতর। 'নন পারফর্মার অথচ পারফর্মার'—এই ভূমিকায় মানানোর মতো স্বাভাবিক দক্ষতাসম্পন্ন তিনি নন। আর এটা কোনওরকম রাখঢাক না করেই বলে ফেলছি।

একই সঙ্গে রাখঢাক না করে এটাও বলা যাক ব্যক্তিগত ধারণার কথাও যে, তিনি মিয়াঁদাদ হবেন না। বরং ক্রিকেটজীবনের দ্বিতীয় ওভারেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন।

প্রথমত মিয়াঁদাদের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক পরিণত। অনেক স্থিতধী মানুষ এবং তুলনায় কম আবেগপ্রবণ। শুনলে আশ্চর্য লাগতে পারে। এমনকী, গাওস্করের চেয়েও। দ্বিতীয়ত, অন্যের ভাবনা না ভাবার যে কালির ছিটে শার্টে আজও অল্পবিস্তর লেগে আছে তা মোছার ডিটারজেন্ট এবার কপিলের পকেটে অবশ্যই থাকবে। এবার তো আর ব্যক্তিগত সাফল্য নিয়ে নিজের চিন্তা কেন্দ্রীভূত থাকার ব্যাপারটাই নেই। যা ভাবছেন সবার জন্য ভাববেন। আর তিন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট—ক্রিকেট পরিকল্পনায় তাঁর খাদ থাকার তত্ত্বটাও বোধহয় এবার উড়ে যেতে চলল। ক্রিকেট স্মার্টনেস না থাকলে কোনও লোক ৪৩৪ উইকেট পায় না।

আমার চিন্তা অন্য। সফল তো হবেন, কিন্তু তার পর এই কাজে লেগে থাকার মতো মোটিভেশন পাবেন তো কপিল দেব? বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী এখন তাঁর। ক্রিকেটমাঠ তো নেহাতটা পুঁচকে, একফালি জায়গা। দু'বছরের চুক্তি ফুরোবার আগেই না হঠাৎ করে ডাকা একটা সাংবাদিক সম্মেলনে ঢুকে শুনতে হয়, "মা বলতেন, কুত্তু যব ভি ছোড় না, হাসকে ছোড় না!"

কাঠমন্ডুতে সাফ গেমসে সাতটি সোনা জিতে সাঁতারু নিশা ম্যালেট আপাতত খবরের শিরোনামে। ২০০২ সালের এশিয়ান গেমসে কতটা সফল হবেন তিনি? জানিয়েছেন প্রদীপ্ত রায়চৌধুরী

নিশার লক্ষ্য আগামী এশিয়াডের সোনা

কাঠমন্ডুর সুইমিং পুল তোলপাড় করে সাতটি সোনা জেতার পর নিশা ম্যালেট আপাতত ব্যস্ত মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেওয়ার জন্য। বেড়ানো বা পড়াশোনার জন্য নয়, নিশার আমেরিকা যাওয়ার কারণ, সাঁতারে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ নেওয়া। আন্তর্জাতিক সাঁতার সংস্থার স্কলারশিপ নিয়ে নিশা আপাতত যাচ্ছেন তিন মাসের জন্য। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি যাচ্ছেন মার্কিন মুলুকে। আগেরবার অনুশীলন করেছেন বিখ্যাত কোচ গ্যারি হলের কাছে।

গিয়ে লাভ কতটা হয়েছে? লাভক্ষতির হিসেবটা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন নিশা নিজেই। "আগে সাঁতার কাটতাম, আর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামতাম। আর এখন প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার কাটি।" সাঁতার আর প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের পার্থক্য কী? নিশার মতে, আগাগোড়াই পার্থক্য। মিল বলতে শুধু দুটোর জন্যই জলে নামতে হয়।

কাঠমন্ডুতে নিশার অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে গ্যারি হলের ভূমিকা কতখানি? তাঁর মতে, "ওদেশে গিয়ে সাঁতারের প্রশিক্ষণ না নিলে এত সোনা আসত না।" বাংলার কোচ বিশ্বজিৎ দে চৌধুরী অবশ্য অন্য কথা বলছেন। ওঁর মতে, মানসিকতাই নিশাকে এতদূর এগিয়ে দিয়েছে। বাংলার সাতারুরা সাঁতার কাটেন, প্রতিযোগিতায় অংশ নেন স্রেফ চাকরি জোটানোর জন্য। চাকরি জুটে গেলেই তাঁদের অনুশীলনে ভাটা পড়ে, হারিয়ে যায় জয়ের খিদেটা। নিশার ক্ষেত্রে কখনওই তা হয়নি। জলে সাফল্যই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, উপলক্ষ নয়। আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্যই মাত্র ১২ বছর বয়সে নিজের রাজ্য তামিলনাড়ু ছেড়ে বাঙ্গালোরে পাড়ি দেন নিশা। কারণ কর্নাটকের রাজধানীতে অনুশীলনের সুযোগ বেশি। ভাল প্রশিক্ষক আছেন, আছে আধুনিক মানের 'সুইমিং পুল'। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী নিশা বাঙ্গালোরের মাউন্ট কারমেল কলেজে পড়াশোনা করছেন।

হঠাৎ সাঁতারে ঝোঁক কেন? টেনিস ব্যাডমিন্টন নয় কেন? নিশার বক্তব্য হল, "এটা স্রেফ পছন্দের ব্যাপার। ছেলেবেলা থেকে টেলিভিশনে সাঁতার দেখে সাঁতারু হওয়ার ইচ্ছেটাই মাথায় ঢুকেছিল।" দিদিকে দেখে তাঁর ছোট বোন রেশমা ম্যালেটও বড় সাঁতারু হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। কর্নাটকে মেয়েদের বিভাগে নিশার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর বোন রেশমাই।

পুলে নেমে বোনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কেমন লাগে? কোনও বাড়তি অনুভূতি? "না না, সেরকম কোনও কিছু নয়। আসলে প্রতিযোগিতার সময় কে ভাই, কে বোন অত খেয়াল রাখা যায় না," জানান নিশা। প্রসঙ্গত, বাঙ্গালোরে দুই বোনই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন কোচ প্রদীপ কুমারের কাছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে নিশার লক্ষ্য কী? ওলিম্পিকের পদক, না কি ২০০২ সালের এশিয়াড? তাঁর বক্তব্য হল, "ওলিম্পিকে ভাল কিছু করার সম্ভাবনা কম। আমাদের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলোর পার্থক্য খুব বেশি। বরং এশিয়ান স্তরে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।" চিন, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার সাঁতারুরা ইদানীং সাফল্য পেলেও নিশার মতে, ওদের ধারাবাহিকতার অভাব আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানির সাঁতারুদের এই অভাবটা নেই। সব দিক ভেবে, চিন্তা করে নিশা ২০০২ সালের এশিয়ান গেমসকে লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তবে এশিয়াডে এত ইভেন্টে নামতে চান না তিনি। তাঁর পছন্দ তিনটে বা চারটে ইভেন্ট। কোন-কোন ইভেন্ট? এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি পুরো পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। যতদিন সাফল্য পাবেন বা পাওয়া সম্ভব বলে বুঝবেন, ততদিন পুলে থাকবেন। তারপর ক্রীড়া মনস্তত্ত্ববিদ হওয়ার ইচ্ছে। তবে পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া মোটেই পছন্দ নয় নিশার। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর তাঁর 'সাইকোলজি' নিয়ে পড়ার ইচ্ছে। তবে আপাতত ২০০২ সালের এশিয়ান গেমসই তাঁর লক্ষ্য। আদৌ কি সেখানে গিয়ে তিনি সফল হবেন? কাজটা খুব কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু যেভাবে তিনি এগোচ্ছেন, তাতে অসম্ভবও বলা যায় না।

ডাবল্‌সের বিশ্বখেতাব : ফেভারিট লি-হেশই

দুটো গ্র্যান্ড স্লাম খেতাবের পর লিয়েন্ডার-মহেশ জুটির লক্ষ্য ডাবল্‌সের বিশ্বখেতাব। লিখেছেন প্রতাপ জানা

লিয়েন্ডার-মহেশ জুটি এ বছর যেভাবে একের পর এক সাফল্য তুলে নিয়েছেন তাতে তাঁদের জয়ের দৌড় শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে, তা নিশ্চয়ই গবেষণার বিষয়। লিয়েন্ডারের বয়স ২৬ এবং মহেশ ২৫। এখনও অনেক টেনিস খেলার সুযোগ পাবে এই জুটি। বব হিউয়েট-ফ্রিউ ম্যাকমিলান, জন ম্যাকেনরো-পিটার ফ্লেমিং, জন নিউকোম্ব-টনি রোশ এবং উডিজরা— মার্ক উডফোর্ড-টড উডব্রিজ, বিশ্ব টেনিসের সর্বকালের এই সেরা জুটিদের সঙ্গে লি-হেশ জুটির এই মুহূর্তে তুলনা চলে না ঠিকই, তবে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এই ভারতীয় জুটি যে গতিতে এগোচ্ছেন, তাতে ভবিষ্যতে তাঁরা সর্বকালের সেরাদের মধ্যে চলে এলে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকবে না।

এতদিন খেদ ছিল, গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে খাঁটি ভারতীয় সাফল্য নেই বলে। এ বছর সেই খেদ মিটিয়ে দিয়েছেন লি-হেশ জুটি। জিতেছেন ফরাসি ওপেন ও উইম্বল্‌ডনের ডাবল্‌স খেতাব। শুধু এই নয়, চারটি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের ফাইনালেই খেলেছিলেন এই জুটি এ বছর। ইউ এস ওপেনের ফাইনালে সেবাস্তিয়ান লঁরা-অ্যালেক্স ও' ব্রায়েন জুটির কাছে হারের পর লিয়েন্ডার পেজ বলেছিলেন, "চারটের মধ্যে দুটো খেতাব নিশ্চয়ই খারাপ নয়। বছরটা ভালই কাটল। দুটো গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছি।" মহেশ ভূপতির বক্তব্যও এরই হুবহু প্রতিধ্বনি। এ ছাড়া লিয়েন্ডার ও মহেশ মিক্সড ডাবল্‌সের খেতাব জিতেছেন যথাক্রমে উইম্বল্‌ডন ও ইউ এস ওপেনে। লি-হেশ জুটির কৃতিত্ব— প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে ফরাসি ওপেন ও উইম্বল্‌ডন জয়ের সুবাদে পরপর দুটি গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব জয়। প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে এটিপি সার্কিটে শীর্ষস্থান পেয়েছেন এবং প্রতিটি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে এক নম্বর বাছাইয়ের স্বীকৃতি পেয়েছেন। ডাবল্‌সের সিঙ্গল্‌স র‍্যাঙ্কিংয়ে লিয়েন্ডার পেজ বিশ্বের এক নম্বর ও মহেশ ভূপতি বিশ্বের দু'নম্বর খেলোয়াড়ের মর্যাদা পেয়েছেন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মোট ১৫টি এটিপি খেতাব জিতেছেন এই জুটি। নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, ভারতীয় টেনিসে সর্বকালের সেরা জুটি এঁরাই, অমৃতরাজ ভাইয়েরা— বিজয় ও আনন্দ অথবা রমানাথন কৃষ্ণন-জয়দীপ মুখোপাধ্যায় জুটির কিছু চমকপ্রদ সাফল্য থাকা সত্ত্বেও। সিঙ্গল্‌সের বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে লিয়েন্ডার যেখানে ১৫০-এর কাছাকাছি, মহেশ আরও পেছনে ২৫০-এর কাছে, তখন ডাবল্‌সে এঁদের অসাধারণ সাফল্য ও দুর্দান্ত ধারাবাহিকতার কারণ কী?

ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের 'নন প্লেয়িং' ক্যাপ্টেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "ওরা কোর্টে একে অন্যের পরিপূরক। মহেশের 'রিটার্ন অব সার্ভ' অনবদ্য এবং লিয়েন্ডারের 'নেট প্লে' অসাধারণ। এ ছাড়া নিখুঁত বোঝাপড়া আছে দু'জনের মধ্যে। আর ডাবল্‌সের খেলায় যেটা জরুরি, সেই 'রিফ্লেক্স' দু'জনেরই দারুণ।" '৯৫

এই দশকে বিশ্ব ডাবল্‌সের চ্যাম্পিয়ানরা

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ান	রানার্স
১৯৯০	স্যাংচুয়ারি কোভ	জি ফর্জে/ জ্যাকব লাসেক	সারগিও ক্যাসেল/ এমিলিও সানচেজ
১৯৯১	জোহানেসবার্গ	জন ফিটজেরাল্ড/ আন্দ্রে ইয়ারিড	কেন ফ্ল্যাচ/ রবার্ট সেগুসো
১৯৯২	জোহানেসবার্গ	মার্ক উডফোর্ড/ টড উডব্রিজ	জন ফিটজেরাল্ড/আন্দ্রে ইয়ারিড
১৯৯৩	জোহানেসবার্গ	জ্যাকো এলটিং/ পল হারহুইস	মার্ক উডফোর্ড/ টড উডব্রিজ
১৯৯৪	জাকর্তা	ইয়ান অ্যাপেল/ জোনাস বর্কম্যান	মার্ক উডফোর্ড/ টড উডব্রিজ
১৯৯৫	আইন্দহোভেন	গ্র্যান্ট কনেল/ প্যাট্রিক গলব্রেথ	জ্যাকো এলটিং/ পল হারহুইস
১৯৯৬	হার্টফোর্ড	মার্ক উডফোর্ড/ টড উডব্রিজ	সেবাস্তিয়ান লঁরা/ অ্যালেক্স ও' ব্রায়েন
১৯৯৭	হার্টফোর্ড	রিক লিচ/ জোনাথন স্টার্ক	লিয়েন্ডার পেজ/মহেশ ভূপতি
১৯৯৮	হার্টফোর্ড	জ্যাকো এলটিং/ পল হারহুইস	মার্ক নোয়েল্‌স/ ড্যানিয়েল নেস্টর

সালে দিল্লিতে ডেভিস কাপের খেলায় ক্রোয়েশিয়ার গোরান ইভানেসেভিচ-সাসা হিরজনের বিরুদ্ধে প্রথম জুটি বেঁধেছিলেন এঁরা এবং তা ঘটেছিল নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানেই। ম্যাচ জিতে চমক দিলেও তখন অনেকেই কিন্তু ভাবতেই পারেননি চার বছরের মধ্যে এই জুটিই হয়ে উঠবে বিশ্বসেরা।

'৯৭ সালে চেন্নাইয়ে গোল্ড ফ্লেক ওপেন দিয়ে শুরু হয়েছিল এই জুটির জয়যাত্রা। সে বছরই জেতেন ছ'টি এ টি পি খেতাব। উঠে আসেন চার নম্বরে। ডাবল্‌সে ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়ে তখন মহেশ ছিলেন ১১ নম্বরে এবং লিয়েন্ডার ১৪তে। '৯৮ সালে পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এঁরা জেতেন ছ'টি এ টি পি খেতাব এবং উঠে আসেন দ্বিতীয় স্থানে। মহেশ তিন ও লিয়েন্ডার চার নম্বরের স্বীকৃতি

ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের 'নন প্লেয়িং' ক্যাপ্টেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "ওরা কোর্টে একে অন্যের পরিপূরক। মহেশের 'রিটার্ন অব সার্ভ' অনবদ্য এবং লিয়েন্ডারের 'নেট প্লে' অসাধারণ। এ ছাড়া নিখুঁত বোঝাপড়া আছে দু'জনের মধ্যে। আর ডাবলসের খেলায় যেটা জরুরি, সেই 'রিফ্লেক্স' দু'জনেরই দারুণ।"

পান ডাবল্‌সের ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়ে। আর এ বছর তো এঁরা বিশ্বসেরা জুটি—লিয়েন্ডার এক ও মহেশ দু'নম্বরে। উন্নতির 'গ্রাফ' স্পষ্ট ও পরিষ্কার। রূপকথার উত্তরণ ঘটেছে মাত্র চার বছরের মধ্যে। লি-হেশ জুটির লক্ষ্য সিডনি ওলিম্পিকের সোনা। তার আগে অবশ্য তাঁদের একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে আমেরিকার হার্টফোর্ডে আসন্ন বিশ্ব ডাবল্‌স চ্যাম্পিয়ানশিপে (১৭-২২ নভেম্বর)। "হার্টফোর্ডে জেতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব," বলেছেন মহেশ ভূপতি। বিশ্ব ডাবল্‌স চ্যাম্পিয়ানশিপে লি-হেশ জুটি প্রথমবার খেলেছিলেন '৯৭ সালে, পেয়েছিলেন রানার্সের সম্মান। গত বছর লিয়েন্ডারের চোটের জন্য এই টুর্নামেন্টে ভারতীয়রা তেমন সুবিধে করতে পারেননি। এবার লি-হেশ জুটি বিশ্ব খেতাব না পেলে হবে বিরাট অঘটন।

বাস্কেটবল শিখতে হলে

কলকাতায় বাস্কেটবল শেখার সুযোগ আছে কোন-কোন ক্লাবে? কলকাতার বাইরে কোথায় শেখানো হয় এই খেলা? জানিয়েছেন আর্যভট্ট খান

আমেরিকার বিখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডনকে তাঁর ভক্তরা ভালবেসে ডাকতেন 'এয়ার জর্ডন' বলে। হাওয়া যেমন হাতে ধরা যায় না, মাইকেল জর্ডনকেও তেমনই বাস্কেটবল কোর্টে ধরা যেত না। তিনি একাধিকবার একাই একটা ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট করেছেন। তাঁর শারীরিক সক্ষমতাও ছিল চূড়ান্ত।

এই ফিটনেসই হল বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের প্রধান মূলধন। কারণ পৃথিবীতে যত খেলা আছে, তার মধ্যে দ্রুততায় আইস হকির পরই বাস্কেটবলের স্থান। জনপ্রিয়তায়ও পিছিয়ে নেই এই খেলা। এখন শুধু কলকাতাতেই নয়, কলকাতার বাইরেও বিভিন্ন জেলাতে এই খেলা নিয়মিত হয় এবং শেখানোও হয়।

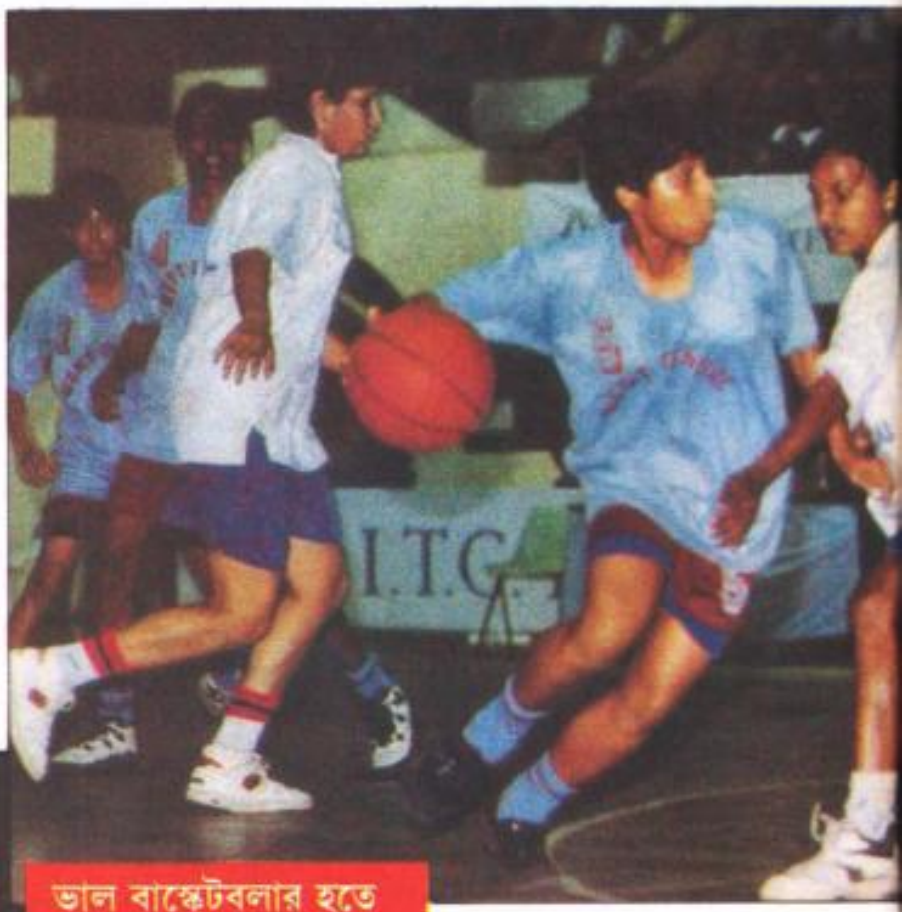

কলকাতায় প্রশিক্ষণ

কলকাতায় শেখানোর ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন ক্লাবে। পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন-এর অধীনে ২২টি ক্লাব আছে। এর মধ্যে ১২টি ফার্স্ট ডিভিশন, ছ'টি সেকেন্ড ডিভিশন ও ছ'টি জুনিয়ার ডিভিশন। যেসব ক্লাবে নিয়মিত বাস্কেটবল শেখানো হয় সেগুলি হল : ওয়াই. এম. সি. এ, ওয়েলিংটন ব্রাঞ্চ; বড়িশা অ্যাথলেটিক ক্লাব; ছাত্র সমিতি, ওয়েলিংটন; চেতলা পার্ক অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং রাখী সঙ্ঘ।

এই ক্লাবগুলিতে রবিবার ছাড়া প্রতিদিনই বাস্কেটবল শেখানো হয়। দুটো করে 'সেশন'। সকালে ও বিকেলে দু'ঘণ্টা করে। এই ক্লাবগুলো স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গরমের ছুটিতে বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থাও করে। প্রথম দফায় কোচিং-এর জন্য কোনও 'ফি' নেওয়া হয় না।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন ময়দানে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে। তবে এই প্রশিক্ষণ কেবলমাত্র গরমের ছুটিতেই দেওয়া হয়। একেবারে নতুনদের জন্য এই প্রশিক্ষণ। সকাল সাতটা থেকে ন'টার এই 'সামার ভেকেশন ক্যাম্প'-এ ভর্তি হতে লাগে ৩০ টাকা। এই

ভাল বাস্কেটবলার হতে গেলে

শুধু লম্বা হলেই হবে না, ভাল বাস্কেটবল খেলোয়াড় হতে গেলে ভাল 'অ্যাথলিট' হতে হবে। এজন্য বাস্কেটবল খেলতে আসার আগে অ্যাথলেটিক্স-এ নজর দিলে ভাল হয়। নজর দিতে হবে 'শুটিং', 'ড্রিবলিং' ও দৌড়ের ওপর। শুটিং, অর্থাৎ বলকে বাস্কেট করাই যেহেতু এই খেলার লক্ষ্য, তাই খেলার শুরুতেই শুটিং প্র্যাকটিস করা জরুরি। বল যেহেতু হাতে করে নিয়ে যেতে হয় তাই বলকে কীভাবে ধরতে হয়, তা শিখতে হবে। বাস্কেটবলে 'ফাউল' হলে ফুটবলের 'পেনাল্টি'র মতোই 'ফ্রি থ্রো' হয়। ফ্রি থ্রো-তে সাফল্য শুটিং ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

ক্যাম্প থেকে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বাছাই করে পরবর্তী ক্যাম্পে নেওয়া হয়। এই ক্যাম্প চলে ছ' সপ্তাহ। ফি ৫০ টাকা। প্রশিক্ষণ দেন প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড়রা।

মফস্বলে প্রশিক্ষণ

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায় পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে খেলা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে এই ব্যবস্থা আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি হল : বীরভূম জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (বোলপুর), বর্ধমান জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (বর্ধমান ও দুর্গাপুর), হুগলি জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (শেওড়াফুলি), হাওড়া জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (হাওড়া), দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (বারুইপুর), জলপাইগুড়ি জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (জলপাইগুড়ি), মুর্শিদাবাদ জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (কান্দি), উত্তর দিনাজপুর জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (রায়গঞ্জ)।

পশ্চিমবঙ্গে বাস্কেটবল খেলার মরসুম হল নভেম্বর থেকে জুলাই। বাস্কেটবল মূলত 'ইনডোর গেম' হলেও আমাদের দেশে ইনডোর বাস্কেটবল কোর্ট খুব কমই আছে। সে কারণে বর্ষাকালে এই খেলা বন্ধ থাকে। নভেম্বর থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট হয়। বিভিন্ন জেলার বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনগুলি থেকে ভাল খেলোয়াড় নির্বাচন করে পশ্চিমবঙ্গ টিম তৈরি করে ন্যাশনাল স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া অনূর্ধ্ব ১৯ বছরের জন্য আছে জুনিয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশিপ। অনূর্ধ্ব ১৩ বছরের জন্য সাব জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ানশিপ। এ ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের লিগের খেলা তো আছেই। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আছে ইন্টার স্কুল লিগ নক আউট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টগুলোর আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন। মেয়েদের জন্য আছে উইমেন্স লিগ নক আউট টুর্নামেন্ট।

পৃথিবীতে যত খেলা আছে, তার মধ্যে দ্রুততায় আইস হকির পরই বাস্কেটবলের স্থান।

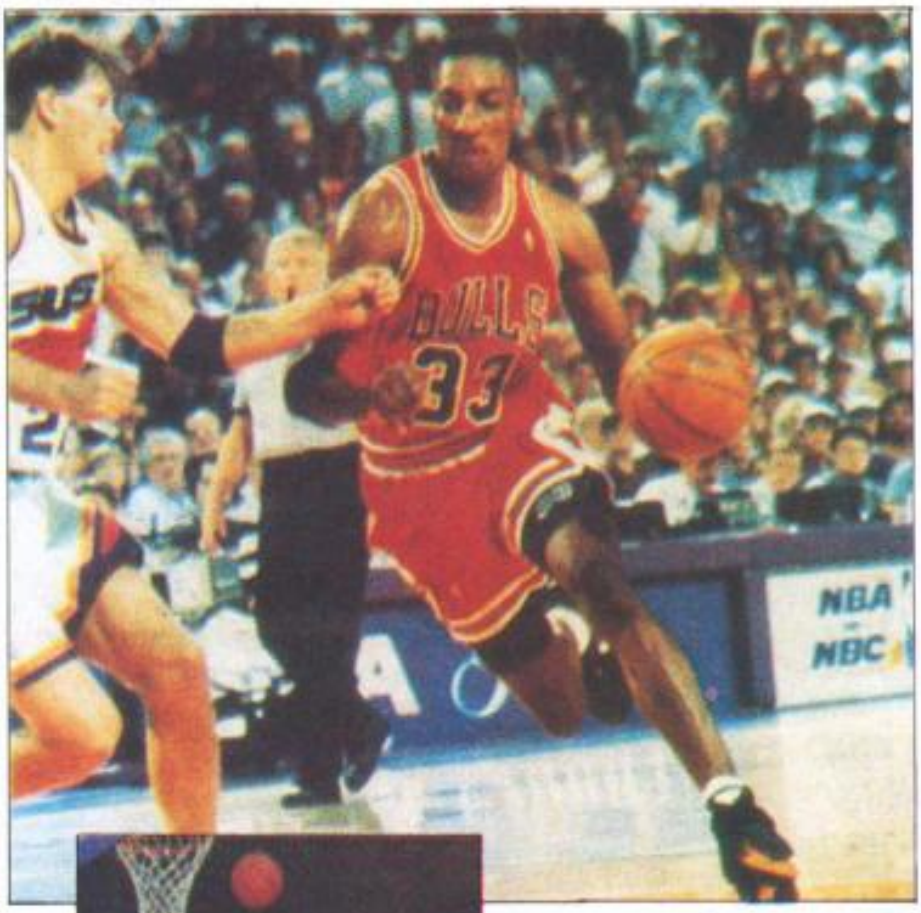

ভারতের প্রাক্তন মহিলা বাস্কেটবল ক্যাপ্টেন অপর্ণা ঘোষ জানিয়েছেন, "বাস্কেটবল খেলোয়াড়কে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, সে যেন কোর্টের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় চলে আসতে পারে। তবেই বল বাস্কেট করার সুবিধে বেশি। ভাল বাস্কেটবলার কোর্টের 'হাফলাইন' থেকেও বল বাস্কেট করার ক্ষমতা রাখেন।"

টেস্টে ওপেনারের অভাব কি পূর্ণ করতে পারবেন দেবাং

অভিষেক টেস্টে মোটামুটি সফল দেবাং গাঁধী। আরও বড় কথা, দেবাংয়ের মধ্যে একজন স্থায়ী ওপেনারের ছায়া দেখা যাচ্ছে এখনই। লিখেছেন চন্দন রুদ্র

জীবনের প্রথম টেস্ট ইনিংসেই শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিলেন গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, গ্রাহাম গুচের মতো ক্রিকেটাররা। পরবর্তীকালে তাঁদের ব্যাট থেকেই বেরিয়ে এসেছে অজস্র রান। মোহালিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে যেন সেই ইতিহাসেরই 'অ্যাকশন রিপ্লে' দেখা গেল। বাংলার উদীয়মান ক্রিকেটার দেবাং গাঁধী প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে ডিগুন ন্যাশের বলে পারোরের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে দেবাংয়ের চওড়া ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসা ৭৫ রানের আত্মবিশ্বাসী ইনিংসটি বুঝিয়ে দিয়েছে, নির্বাচকরা তাঁকে জাতীয় দলে জায়গা দিয়ে কোনও ভুল করেননি।

একসময় টেস্ট ওপেনার হওয়ার দৌড়ে সদাগোপান রমেশের সঙ্গে প্রায় একই জায়গায় ছিলেন দেবাং। কিন্তু গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের সঙ্গে খেলার পর রমেশ জাতীয় দলে চলে এলেও দেবাং কিছুটা পিছিয়ে পড়েন। তবে দমে যাননি। নিয়মিত লড়াই করে গেছেন। কিছুদিন আগে এশীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালের আগে ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েও শেষ পর্যন্ত ভারত ফাইনালে না ওঠায় দেবাংয়ের টেস্ট অভিষেক পিছিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে মাঠে নামা বাংলার ২৬ বছরের এই তরুণ ক্রিকেটারটি এবার তাই আশাবাদী ছিলেন। লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে ভারতীয় 'এ' দলের সফর শেষ করে কলকাতা ফিরেই দেশপ্রিয় পার্কে দক্ষিণ কলকাতা সংসদের মাঠে গোপাল বসুর কাছে অনুশীলনে নেমে পড়েছিলেন। নির্বাচনী সভায় একজন 'স্পেশ্যালিস্ট ওপেনার' হিসেবে দেবাংয়ের সঙ্গে হায়দরাবাদের ভি ভি এস লক্ষ্মণ ও মুম্বইয়ের ওয়াসিম জাফরের নাম উঠলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেন দেবাংই। নির্বাচিত হওয়ার খবর পেয়ে দেবাংয়ের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, "মোহালিতে নিজেকে প্রমাণ করে দলে জায়গা পাকা করতে চাই।" অভিষেক টেস্টে সে কাজে যে দেবাং অনেকটাই সফল, তা অনায়াসেই বলা যায়।

প্রথম ইনিংসে কোনও রান করার আগেই আউট হয়ে গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন দেবাং। যথেষ্ট চাপ নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিলেন। প্রথম উইকেটে রমেশের সঙ্গে ১৩৭ রান তুলে সমালোচনার জবাব দিতে পেরেছেন। ড্রেসিংরুমে ফিরে আসার পর কোচ কপিলদেব, অধিনায়ক সচিন তেন্ডুলকর এবং অবশ্যই বন্ধু সৌরভ পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন তাঁর। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার পঙ্কজ রায় দেবাংকে নিয়ে আশাবাদী, "সফল হওয়ার সব কিছুই ছেলেটির মধ্যে আছে। ব্যাটে কিছু 'টেকনিক্যাল' ত্রুটি থাকলেও সময়ে সব কাটিয়ে উঠবে।" আর-এক প্রখ্যাত ওপেনার ইংল্যান্ডের জিওফ্রে বয়কট দেবাংকে ডেকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন করে ভুল শুধরে নিতে হবে। দেবাংয়ের ব্যাটে খুশি নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চাঁদু বোড়ে ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া সফরে দেবাং-রমেশ জুড়িকে অপরিবর্তিত রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ঘরোয়া রঞ্জি ক্রিকেটে এবার যথেষ্ট ভাল ব্যাট করেছেন দেবাং। অসমের বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে বাংলাই এ-মরসুমে সর্বাধিক ৬ উইকেটে ৬২৮ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে। জয়ও আসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে, ইনিংস ও ২০৬ রানে। এই ম্যাচেই মরসুমের একমাত্র ত্রিশতাধিক (৩২৩) রানের ইনিংসটি আসে দেবাংয়ের ব্যাট থেকে। বিহারের বিরুদ্ধে কলকাতায় খেলেন ২১৬ রানের আর-একটি আকর্ষক ইনিংস। তৃতীয় উইকেটের জুড়িতে রোহন গাওস্করের সঙ্গে যোগ করেন ৩৫৪ রান। রঞ্জির ছ'টি ম্যাচের ন'টি ইনিংসে করেন ৬৮৩ রান। গড় ৭৫.৮৯। ইংল্যান্ডে এবারও মাইনর কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন দেবাং। বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলাকালীন ছিলেন ইংল্যান্ডে। ভারতীয় 'এ' দলে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের সাফল্যে '৯৮-'৯৯ মরসুমে বাংলার বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন দেবাং। এবার কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবও দেবাংয়ের হাতে তুলে দিয়েছে বাংলার সেরা ক্রিকেটারের সম্মান।

ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন আশা বিজয় ভরদ্বাজ

সেভাবে কোচিং নেননি কারও কাছেই। অথচ ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েই নজর কেড়েছেন তরুণ অলরাউন্ডার বিজয় ভরদ্বাজ। তাঁর উঠে আসা নিয়ে লিখেছেন তানাজি সেনগুপ্ত

প্রথম বড় আন্তর্জাতিক আসরে খেলতে নেমেই ক'জন ক্রিকেটার সেই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন? প্রশ্নটা মোটেই কুইজের নয়। সাম্প্রতিক ক্রিকেটের একটি তথ্য মাত্র। ২৪ বছরের তরুণ অলরাউন্ডার বিজয় রাঘবেন্দ্র রাও ভরদ্বাজ অবশ্য এটাকে বড় কোনও ব্যাপার মনে করেন না। মানসিকভাবে দারুণ আত্মবিশ্বাসী বিজয় বলেছেন, "সবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেছি, এখনও অনেক রাস্তা যেতে হবে।"

বিজয় ভরদ্বাজের মানসিকতার প্রশংসা করেও বলতে হয়, তিনি প্রথম টুর্নামেন্টেই যে সাফল্য পেয়েছেন সেটা কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়।

কিনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে চার দেশীয় এল জি কাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারত হেরে গেলেও ভারতের সান্ত্বনা পুরস্কার নিঃসন্দেহে বিজয় ভরদ্বাজের অনবদ্য পারফরম্যান্স, 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' হওয়া। গোটা টুর্নামেন্টে একবার মাত্র আউট হয়ে তিনি করেছেন ৮৯ রান, সঙ্গে ১০টি উইকেট। তিনিই এই সিরিজের আবিষ্কার, ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের আশা।

বিজয় ভরদ্বাজের জন্ম ১৫ অগস্ট, ১৯৭৫ সালে, দক্ষিণ বাঙ্গালোরে। ডাকনাম 'পিঙ্গা'। পড়তেন বিজয়া হাই স্কুলে। অঙ্কে খুব ভাল ছিলেন। পড়তে পড়তেই ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সদ্য নিজের দক্ষতা দেখাতে শুরু করলেও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে কিন্তু বিজয় ভরদ্বাজ কয়েক বছর ধরেই পরিচিত তারকা। কর্নাটকের হয়ে তাঁর সাফল্য বলার মতো। মজার কথা, ভারতীয় দলে তাঁকে অলরাউন্ডার হিসেবে ভাবা হলেও কর্নাটক দলে তিনি ছিলেন প্রধানত ব্যাটসম্যান। গত তিন মরসুম তাঁর ব্যাট থেকে প্রচুর রান এসেছে। রানে কোনও-কোনও সময় কর্নাটকেরই তারকা রাহুল দ্রাবিড়কেও ছাপিয়ে গেছেন তিনি। গত মরসুমেই

রান করেছেন ১০ ম্যাচে ১২৮০। গড় ১০৬.৬৬। এটা একটা রেকর্ড। তাঁর বোলিং দক্ষতা প্রধানত নজর কাড়ে এই মরসুমে। রঞ্জি ট্রোফির ফাইনালে দুর্ধর্ষ বোলিং করেন ভরদ্বাজ। মধ্যপ্রদেশের ছ'টি উইকেট তুলে নেন তাঁর স্পিনের কারুকাজে। মূলত তাঁর এই কৃতিত্বেই রঞ্জি ট্রোফি জেতে কর্নাটক। ব্যাটের পরে বলেও এই অসাধারণ দক্ষতা দেখানোর ফলে তাঁকে অলরাউন্ডার হিসেবে ভাবা হতে থাকে। বাঙ্গালোর ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাবের এই তারকা ক্লাব স্তর থেকে নিজেই নিজের কোচ। অন্যদের দেখে শিখেছেন, কিন্তু কদাপি কোনও কোচের কাছ থেকে ট্রেনিং নেননি। তাঁর সতীর্থ বহু ক্রিকেটার প্রথাগত কোচিং নিলেও সে-পথে হাঁটেননি ভরদ্বাজ। সময় পেলেই মাঠে গিয়ে শুধু অনুশীলন করেছেন। এবং ওই অনুশীলনের জোরেই তিনি আজ ভারতের নবীন নায়ক।

সচিন তেন্ডুলকর সম্পর্কে অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল ভরদ্বাজের প্রতিক্রিয়া, "ও তো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। জিনিয়াস। ওকে নিয়ে আমার কিছু বলা মানায় না। " তাঁর আদর্শ হলেন কর্নাটকেরই রাহুল দ্রাবিড়। "ও-ই আমার আদর্শ। ওকে সামনে রেখেই এগোতে চাই।" দ্রাবিড়ের ব্যাটিং স্টাইলের সঙ্গে মিল না থাকলেও টেকনিকের দিক দিয়ে রাহুলের মতো 'সলিড' হওয়ার চেষ্টা ভরদ্বাজের। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ, ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস। একদিনের টুর্নামেন্টে সাফল্যের পরেই টেস্ট দলে ডাক পেয়ে খুশি ভরদ্বাজ বলেছেন, "দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব।"

নাইরোবিতে কিনিয়ার বিপক্ষে ব্যাটে দ্রুত ৪১ নট আউট-এর পর হাত ঘুরিয়ে তিনটি উইকেট প্রাপ্তি দেখে মুগ্ধ টেলিভিশন ভাষ্যকার জিওফ বয়কট। তিনি পরে মন্তব্য করেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনের শুরুতেই ভরদ্বাজ যে ইতিবাচক মানসিকতা দেখাচ্ছে এবং যেভাবে সোজা ব্যাটে খেলছে, তা উৎসাহব্যঞ্জক।" এল জি কাপে ভারতীয় দলের অধিনায়ক অজয় জাডেজাও ভরদ্বাজের মানসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেছেন, "দলের কথা ভেবে খেলে ও। অধিকাংশ তরুণই প্রথম সুযোগ পেয়ে নিজের পারফরম্যান্সের কথা ভাবে। বিজয় ব্যতিক্রম। দলের লক্ষ্যর দিকে তাকিয়েই ব্যাটিং করেছে, বোলিং করার সময়েও দলের কথাই ভেবেছে।" ভারতীয় দলের তৎকালীন কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়ও ভরদ্বাজের দক্ষতায় মুগ্ধ। তাঁর কথা, "ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ এই ছেলেটি। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্রিকেটার, দায়িত্ব নিতে সর্বদা প্রস্তুত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাড়া জাগিয়ে শুরু করা সহজ কথা নয়। বিজয় ভরদ্বাজ তা করে দেখাল। আমার বিশ্বাস, ও ভাল খেলবেই।"

ছবি : অনুপ রায়

খেলার খবর

মারাদোনাকে নিয়ে ফিল্ম

বিশ্ব ফুটবলের রাজকুমার দিয়েগো মারাদোনাকে নিয়ে একটি টেলিভিশন ফিল্ম তৈরি হতে চলেছে। এই ফিল্ম নিয়ে প্রবল উৎসাহী স্বয়ং মারাদোনাই। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, অনেক না বলা কাহিনী ও সত্য ঘটনা থাকবে ওই ফিল্মে। মারাদোনার পায়ের কাজ যেমন একসময় মুগ্ধ করে রেখেছিল সারা বিশ্বকে, তেমনই বিতর্কও তাঁকে তাড়া করে গিয়েছে সারা ফুটবল জীবন। এই বিতর্ক, মারাদোনার মতে, যা অধিকাংশই মিথ্যে অভিযোগকে কেন্দ্র করে, তারও জবাব দেওয়ার চেষ্টা থাকবে এই ফিল্মে। তিনটি ৯০ মিনিটের এপিসোডে তাঁর জীবনীটি তোলা হবে। মারাদোনার জীবনের অনেক কাহিনী তো থাকছেই, তবে এটির বড় আকর্ষণ তাঁর পায়ের জাদুর পর্যাপ্ত 'ফুটেজ'। কে কে এই ফিল্মে অভিনয় করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। মারাদোনার নিজের ইচ্ছে, তাঁর নাম ভূমিকায় অভিনয় করুন আর্জেন্টিনার অন্যতম সেরা চিত্রতারকা জার্মান পালাসিয়স। মারাদোনা বলেছেন, "আমার ভূমিকায় অভিনয় করা সহজ কাজ নয়। কোনও বড় অভিনেতা ছাড়া সম্ভব নয়।" এই ফিল্ম তুলতে আপাতত খরচ ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার। আশা করা হচ্ছে, আগামী বছরই কাজ শুরু হবে এবং ২০০১ সালের প্রথম দিকেই এই ফিল্মের কাজ শেষ হবে।

আলির মেয়ে বক্সিংয়ে

বক্সিং-এর প্রবাদপুরুষ মহম্মদ আলির মেয়ে লায়লা বাবার পথ ধরে বক্সিং জগতে চলে এলেন। পেশাদারি লড়াইয়ে অংশ নিলেন ২১ বছরের লায়লা আলি। লায়লা পেশায় ছিলেন মডেল, একটি সেলুনও চালাতেন। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই বক্সিংয়ের প্রতি তাঁর ছিল অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। বাবাকে যদিও কোনওদিন বক্সিং রিং-এ দেখার সুযোগ হয়নি তাঁর, তথাপি বাবাকেই আদর্শ করে এগিয়েছেন তিনি। ৫৭ বছরের আলি দুরারোগ্য পারকিনসন্‌স রোগে আক্রান্ত হলেও মেয়েকে টিপ্‌স দেওয়ার ব্যাপারে এখনও সমান উৎসাহী। লায়লা বলেছেন, "আমার কোনও কোচের দরকার নেই। সর্বকালের সেরা বক্সার আমাকে শেখাচ্ছেন। এর পরে আর শিক্ষার দরকার আছে?"

১.৭৮ মিটার লম্বা, ৭২ কিলোগ্রাম ওজনের লায়লা আলি নিজের প্রতি খুব আস্থাশীল।

১০ উইকেটের বর্ণনা

স্পিনার অনিল কুম্বলের সময়টা এখন খুব ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু উল্লসিত হওয়ার মতো একটা খবর তাঁর কাছে আছে।

এই বছরের শুরুতে টেস্টে তাঁর ১০ উইকেট পাওয়ার সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য টি ডব্লিউ আই সংস্থা একটি ফিল্ম তৈরি করছে। ফিল্মটি ৪০ মিনিটের। এতে থাকছে কুম্বলের বাবা-মা, সতীর্থদের মন্তব্য, হর্ষ ভোগলের মতো ক্রীড়াভাষ্যকারের সাক্ষাৎকার, ১০ উইকেট পাওয়া আর-এক নায়ক জিম লেকারের ফুটেজ এবং তাঁর পাওয়া ১০ উইকেটের প্রতিটি সম্পর্কে অনিল কুম্বলের নিজস্ব বিশ্লেষণ। ম্যানেজার নভনীত শর্মা জানিয়েছেন, "কুম্বলে ১০ উইকেট পাওয়ার সময় যতটা উত্তেজিত ছিলেন, এই ফিল্ম তৈরির সময় তার চেয়ে কম উত্তেজিত ছিলেন না।"

টাইগার উড্‌সের রেকর্ড

বিশ্বের এক নম্বর গল্‌ফ তারকা টাইগার উড্‌স দুটি বিষয়ে সম্প্রতি রেকর্ড গড়লেন। পয়েন্ট প্রাপ্তিতে তিনি যেমন এখন গল্‌ফ-বিশ্বে এক নম্বর, তেমনই অর্থ-উপার্জনেও সকলকে টেক্কা দিয়েছেন তিনি। ১৯৯৬-এ র‍্যাঙ্কিং-পয়েন্ট চালু হওয়ার পর থেকে উড্‌সই গড়পড়তা পয়েন্টে সকলের আগে, তাঁর 'অ্যাভারেজ' ১৬.৬৮ এবং এ বছর তাঁর পয়েন্ট ৫৫৬। এত ভাল পয়েন্ট আর কারও নেই। অর্থ উপার্জনে মাত্র তিন বছরেই উড্‌স এক নম্বর, তাঁর মোট অর্থপ্রাপ্তি এখন পর্যন্ত ১ কোটি ডলার, এ বছরই আয় করেছেন ৪৫ লক্ষ ডলার। কোনও গল্‌ফ খেলোয়াড়ের এই আয় নেই। বলা বাহুল্য, ২৩ বছরের উড্‌সের পেশাদারি গল্‌ফে আসা মাত্রই তিন বছর আগে, ১৯৯৬ সালের ২৬ অগস্ট।

দর্শক

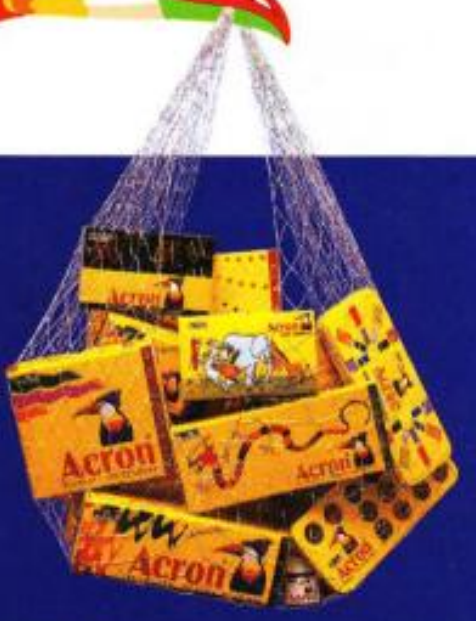

বাচ্চারা শোনো !
বিশ্বমানের আর্ট মেটিরিয়াল সম্ভার
তোমাদের জন্যে এল এবার।
রঙগুলি কত ঝলমলে।
শেডগুলি একদম ঠিক বলা চলে।
স্কুল হোক, শখ বা মজায়,
সবার জন্যে চাই-ই চাই !
পিডিলাইট
অ্যাক্রন®
কল্পনার পাখা মেলে দাও
• পোস্টার কালার • অয়েল কালার • ওয়াটার কালার কেক ও টিউব
• অয়েল প্যাস্টেল • ওয়াক্স/প্লাস্টিক ক্রেয়ন্স • পেপার গ্লিটার্স
ফেভিকল -এর প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে
PUBLICIS-ZEN PID 171 99 BEN